মহামানুষ মুহ্‌সিন

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী



মহামানুষ মুহ্‌সিন

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

মুক্তধারা

মুক্তধারা ১৩৭৫

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০
প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৯৫
প্রচ্ছদ-শিল্পী গোলাম সারোয়ার

মুদ্রাকর
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

মূল্য ২৪·০০ টাকা

MAHAMANUSH MUHSIN
[Life Sketch of Haji Muhammad Muhsin]
By Md. Wazed Ali
Second Edition September 1988
Cover Design Golam Sarwar
Publisher C. R. Saha

MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka 1100
Bangladesh

Price Taka 24·00

"There is
One great Society alone on Earth,
The noble living and noble deed"
—Wordsworth

দু'টি কথা

মহামানুষ হাজী মুহম্মদ মুহ্‌সিনের নাম জানেন না, এমন লোক অন্তত বাংলাদেশে কেহ নাই। তাঁহার ত্যাগ, সন্ন্যাস ও দানশীলতা, তাঁহার পরদুঃখকাতর নিরহঙ্কার চিত্ত, ধার্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব উদার দৃষ্টি, তাঁহার বিদ্যা, জ্ঞান, ভূয়োদর্শন, দৈহিক শক্তি---সকল বিষয়েই তিনি সাধারণ মানুষের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। এই জন্যই সকলের শ্রদ্ধাসুন্দর প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেও বাঙালী তাঁহাকে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছে।

হাজী মুহ্‌সিনের জীবন-কথা অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও তাঁহার জীবন খুব ক্ষুদ্রপরিসর ছিল না। তিনি দীর্ঘদিন বাঁচিয়াছিলেন এবং সংখ্যাহীন ছোট বড়ো ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আপনাকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচিত কিংবা অন্যের রচিত কোনো বিস্তৃত ও বিশ্বস্ত জীবনী এখন পাওয়া যায় না। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী আমাদের অনেক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিত; তাহাও আমরা পাই না।

হাজী মুহ্‌সিন বাংলার গৌরব, বাঙালী মুসলিমের গৌরব। তাঁহার জীবন-কথা যতটুকু জানিতে পারা যায়, ততোটুকুই আলোচনা করিলে মহত্ত্বের দিকে অনেকের প্রবৃত্তি বাড়িবে, আমাদের সমাজে তাঁহার ন্যায় মহামানুষের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল ইহা স্মরণ করিয়া আমাদের আত্মবিশ্বাস হয়তো আবার খানিকটা ফিরিয়া আসিবে। ---এই আশা আমাদের ক্ষতিকণ্টকিত জীবনে হয়তো কিছু লাভ আনিয়া দিবে। এই জন্য প্রচুর অযোগ্যতা এবং অপ্রচুর উপকরণ লইয়াও এই ছোটো বইখানি লেখা হইল।

[প্রথম সংস্করণ থেকে গৃহীত]

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার 'আমীর আলী' পুস্তকের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব লিখিয়াছেন, "আমাদের সমাজে কিছুকাল ধরে কোন গগনচুম্বী প্রতিভার জন্ম হয় নাই সত্য ; কিন্তু ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে যে সব গুণী একালে আমরা পেয়েছি তাঁদেরও যথা-যোগ্য স্থানে সাজিয়ে আমাদের বর্তমান অবস্থার ভালমন্দ সম্বন্ধে সজাগ হবার কোনো প্রয়াস আমাদের ভিতরে দেখা গেছে কি?" প্রশ্ন গুরুতর সন্দেহ নাই। যে সমাজে প্রতিভার জন্ম হয় না, যে সমাজে গুণের সমাদর নেই, যে সমাজ তার চিন্তানায়কদের সম্পর্কে সজাগ নয়, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ না হইয়া উপায় কি? তবে কথা হইতেছে এই, "আমাদের বর্তমান অবস্থার ভালমন্দ সম্বন্ধে সজাগ হবার কোন প্রয়াস" আমাদের ভিতর দেখা যাইতেছে না, একথা সত্যি নয়। সামান্যভাবে হইলেও প্রয়াস যে শুরু হইয়াছে বুলবুলের 'উন্নতজীবন গ্রন্থমালা' পড়িলেই তা বেশ বোঝা যাইবে।

হাজী মুহম্মদ মুহসিন, আমীর আলী, নবাব আবদুল লতীফ, মিসেস রোকেয়া হোসেন---এঁরা শুধু বাঙলার নন, শুধু মুসলমান সমাজের নন---এঁরা জাতিধর্মনির্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষের।

হাজী মুহ্সিনের দানের কথা বাঙালী এখনো ভুলিতে পারে নাই। তাঁর অর্থে প্রতিষ্ঠিত মুহ্সিন ফাণ্ড হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য পান নাই বাঙলার মুসলমান সমাজে এমন লোক বিরল। বিচারপতি আমীর আলী সাহেবও মুহ্সিনেরই অর্থসাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শুধু দানশীলতা নহে "মুহ্সিনের পরদুঃখ-কাতর নিরহঙ্কার ধার্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব উদার দৃষ্টি, তাঁহার বিদ্যা, জ্ঞান, ভুয়োদর্শন দৈহিক শক্তি---সকল বিষয়েই তিনি সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে ছিলেন।"

মুহ্সিন ভাল লাঠি খেলা ও তলোয়ার খেলা জানিতেন। সাহিত্যিক প্রতিভাও তাঁর কম ছিল না, হাতের লেখা ছিল তাঁর মুক্তার মতো

সুন্দর। বাহাত্তর কপি কোরান তিনি নকল করিয়াছেন এবং এর এক একখানি হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

দেশভ্রমণের ফলে মুহ্সিনের জ্ঞানের পরিধি অসাধারণ রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, মক্কা, মদিনা, কায়রো, নজফ প্রভৃতি মুস্লিম জগতের জ্ঞানকেন্দ্রসমূহ ঘুরিয়া "সংখ্যাতীত ছোট বড় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আপনাকে তিনি বিকশিত করিয়াছিলেন।"

দুঃখের বিষয় মুহ্সিনের জীবনীর উপকরণ যথোপযুক্তভাবে রক্ষিত হয় নাই। তাঁর স্টেটের মতোয়াল্লিগণ, গবর্ণমেন্ট রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট, ইমামবাড়া কমিটি, হুগলী কলেজ, অথবা মুহসিনের টাকায় মানুষ হইয়াছেন এমন গুণী ব্যক্তিরা—কেহই এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। মুহসিনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, তাঁর হাতের লেখা কোরান, একসময় ইমামবাড়ায় রক্ষিত ছিল শোনা যায়। কিন্তু এখন এসব পাওয়া যাইবে কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্টই অবকাশ আছে।

মুহসিনের সম্পত্তির উদ্বৃত্ত টাকা হইতে হুগলী কলেজের সূত্রপাত হয়। সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসর যাবৎ এই কলেজের জন্য মুহ্সিন ফাণ্ড হইতে বৎসরে প্রায় ৭৫ হাজার টাকা করিয়া খরচ হইত। কলেজের নাম ছিল প্রথমে হুগলী মুহ্সীন কলেজ। পরে কি ভাবে বলা মুশকিল মুহ্সিনের নাম বাদ পড়িয়া যায়। বাঙলার প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, বাংলার প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট খানবাহাদুর দিলাওয়ার হোসেন, বিচারপতি আমীর আলী, স্যার শামসুল হুদা, স্ত্রীশিক্ষার অগ্রনায়িকা মিসেস আর. এস. হোসেনের স্বামী খানবাহাদুর সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ মনীষীরা মুহ্সিন কলেজে মুহ্সিনের অর্থে শিক্ষালাভ করেন। বলিতে কি, বর্তমান বাংলার অনেকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে মুহ্সিনের দানের ছায়ায়। শুধু মুসলমান নয়, হিন্দুরাও মুহ্সিন ফাণ্ড হইতে সাহায্য পাইয়াছেন। প্রথম প্রথম মুহ্সিন কলেজের কয়েক শত ছাত্রের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল অমুসলমান।

মুহসিনের টাকার অপব্যয় যথেষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে কেবল হতভাগ্য মোতাওয়াল্লীরাই দায়ী তা নয়, গবর্ণমেন্টেরও দায়িত্ব এ

বিষয়ে যথেষ্ট। তহবিল তসরূপ ছাড়াও নানাভাবে গবর্ণমেন্ট ইচ্ছামত মুহ্‌সিনের টাকা খরচ করিয়াছেন। মুসলমান সমাজের প্রতিবাদের দিকে কর্ণপাত করা কেহই তখন প্রয়োজন মনে করেন নাই। ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার এ বিষয়ে তাঁহার পুস্তকে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। জনৈক ইংরেজ সিবিলিয়ানের যে উক্তি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে এ বিষয়ে মুসলিম সমাজের মনোভাব কিরূপ তীব্র তার পরিচয় পাওয়া যাইবে ঃ—Rightly or not, the Muhammadans do think that Government has behaved unjustly, and even meanly towards them in this matter, and it is a standing sore and grievance with them. মুহ্‌সিন ফাণ্ড সম্পর্কে যে অবিচার হইয়াছে সম্প্রতি তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত দেখা যাইতেছে। এবার হুগলী কলেজের নামের সঙ্গে নূতন করিয়া মুহ্‌সিনের নাম জুড়িয়া দেওয়া হইল।

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ

অমর মুহ্‌সিন

মরজগতে হাজী মুহম্মদ মুহ্‌সিন অমর। সংসারে অগণিত নরনারী জন্মগ্রহণ করিতেছে, মাতা-পিতার আদর-যত্নে সুখে-স্বচ্ছন্দে লালিত হইতেছে, উপযুক্ত বয়সে অর্থ উপার্জন করিতেছে, আহার-বিহারে তৃপ্ত হইয়া পৃথিবীর বুকে নিজেদের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বহিয়া চলিতেছে, শত শত তুচ্ছ স্বার্থের বন্ধনে জড়িত হইয়া সম্মুখের রাজপথের দিকে অন্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তারপর দিন ফুরাইয়া গেলে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। ইহারা অতি সাধারণ মানুষ। জীবনেই বা ইহাদের কয়জন বাঁচিয়া থাকে? কয়জন সাধারণ প্রাণী জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া উদার দৃষ্টি দিয়া জগতের দিকে চাহিতে পারে? যিনি পারেন, তিনিই সত্যকার মানুষ; তিনিই প্রকৃত পক্ষে আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া আছেন, এবং মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া থাকিবেন।

সত্যই, শুধু জীবিত থাকার অর্থ বাঁচিয়া থাকা নয়। আমাদের আশেপাশে, সম্মুখে-পশ্চাতে সংখ্যাহীন মানুষ আসিতেছে, যাইতেছে; হাসি-কান্নার রোলে শূন্য আকাশ পূর্ণ করিতেছে; উৎসব-আয়োজনে সুন্দর ধরণীকে আরো সুন্দর, আরো মনোরম করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু তাহাদের কথা আমরা স্মরণ করি না, তাহাদের জন্য আমাদের অন্তরে শ্রদ্ধার আসন রচিত হয় না। তাহাদের জীবন তাহাদের কাছে সত্য নয়; জগতের কাছেও তাহা সত্য হইতে পারে না। তাই জীবনেও তাহারা বাঁচিয়া নাই। মরণ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে এক অভেদ্য যবনিকার অন্তরালে লইয়া যায়।

কিন্তু কোনো কোনো মানুষ সত্যই বাঁচিয়া আছেন। জীবনে বাঁচিয়া ছিলেন, মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া আছেন, ভাবীকালে বহুদিন

পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন। জগৎ তাঁহাদের নাম স্মরণ করিতেছে এবং অনাগত দিনেও স্মরণ করিবে। সত্যকার জীবন এই শ্রেণীর মানুষের। তাঁহারা মরজগতের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন, সাধনাই তাঁহাদের অবলম্বন। চিন্তা-সাধনা, কর্ম-সাধনা হিত-সাধনা, —এই সবের ভিতের দিয়াই তাঁহারা আপনার বৃহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, মমতার বন্ধনে জগৎকে বুকে জড়াইয়া ক্ষুদ্রকে সুমহান বৃহত্তের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। জগতে তাঁহারা মৃত্যুহীন প্রাণ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাই আবার জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। তাই মৃত্যুর মুঠার মধ্যে জন্মিয়াও তাঁহারা অমর; জড়দেহের ধ্বংসপ্রাপ্তির পরেও তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ী চিরঞ্জীব।

হাজী মুহম্মদ মুহসিন এই শ্রেণীর একজন মহামানুষ। মরজগতে জন্মিয়া, জীবনের পরপারে চলিয়া গিয়াও তিনি আমাদের কাছে অমর হইয়া আছেন।

মুহ্‌সিন বস্তুতই একজন মহামানুষ ছিলেন। রাজভোগ তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছিল, তিনি তাহা হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, মণিকাঞ্চন তাঁহার ভাণ্ডারে জমিয়াছিল, তিনি অকাতরে তাহা মানুষের হিতকামনায় বিলাইয়া দিয়াছেন। ঐশ্বর্যের মধ্যে তিনি বাস করিয়াছেন, তাহার সুব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতে হইয়াছে. কিন্তু ধূলিমাটির আবর্জনা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সংসার ত্যাগ করিয়া গহন বনে গিয়া তিনি বাস করেন নাই; কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থ-কোলাহলের ঊর্ধ্ব হইতে এক কল্যাণ-আহবান তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত মন-প্রাণ তাহাতে সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী তিনি, চারিদিকে তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, দাস-দাসী, লোকজন। কিন্তু তিনি তাহাদের প্রভু ছিলেন না। ছিলেন তাহাদের ব্যথার ব্যথী, দরদী বন্ধু। মানুষের দুঃখ দেখিলে তাঁহার চিত্ত গলিয়া যাইত, তিনি অশ্রুসজল চোখে তাহাদের দুঃখ দূর করিতেন। এই মহত্তই ছিল তাঁহার জীবনের

মুল ভিত্তি. প্রধান অবলম্বন। তাই সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার নিদ্রা হইত না, নিশীথের অন্ধকারে সংগোপনে তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কে কোথায় দুঃখাতুর আপনার দুর্ভাগ্যে বিলাপ করিয়া নিশি যাপন করিতেছে, কে কোথায় রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া আর্তনাদ করিতেছে, তাহারই সন্ধানে তিনি পথে পথে ফিরিতেন। কারণ আপনাকে তিনি ভুলিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার ধন-জন অর্থ সম্পত্তি যত কিছু বিষয়-বৈভব, সমস্তকে তিনি সকলের করিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া বলিয়াছিল ঃ প্রভু হে আমার, ধনজন আমি কামনা করি নাই, অর্থ সম্পত্তি আমি প্রার্থনা করি নাই ; তোমারই ইচ্ছায় যদি আজ এ-সব আমার অধিকারে আসিয়া থাকে, যেন ইহাদের বিনিময়ে আমার আত্মাকে বিক্রয় না করি, বিষয়লোভে আমাকে যেন কলুষিত না করি।—আমার সুখের জন্য যদি ধন-সম্পত্তি ব্যয়িত হয়, তোমারই পবিত্রনামের অবমাননা হইবে, প্রভু। কখনো যেন সে-চিন্তা আমার চিত্ত অধিকার না করে। ভক্তের এই আকুল প্রার্থনা বিধাতা শুনিয়াছিলেন। মুহ্‌সিন আত্মসুখের জন্য মুহূর্তের জন্যও লালায়িত হন নাই। ব্যথিতের বেদনা দুর করিবার জন্যই তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, পরের মঙ্গলের জন্য বহুমূল্য সম্পত্তি দান করিয়া আকাশের মতো উদার প্রাণের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাই তিনি আজ মানুষের স্মৃতিতে অমর। মানুষের ভোগ-বিলাস ক্ষণিকের ; ব্যথা-বেদনা তাহার চিরদিনের। সেই ব্যথা-বেদনার মধ্যে মুহ্‌সিনের মধুময় মন বিরাজ করিতেছে ; তাই তিনি চিরদিনের জন্য দুঃখলাঞ্ছিত এই জগতে স্মরণীয় হইয়া আছেন।

তাঁহার সম্পত্তির আয় বড়ো অল্প ছিল না ; তাঁহার সম্ভ্রম-মর্যাদাও সেকালে বড়ো অল্প কামনার সামগ্রী ছিল না। তথাপি তিনি সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া মানুষের মহান ব্রতকে বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন, হাজার হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি সানন্দে জনহিতের জন্য বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার এই মহত্ত চিরদিন মানুষকে সৎ ও মহৎ জীবনের প্রেরণা দান করিবে, ধূলিমলিন সংসারের উর্ধ্বে টানিয়া অনন্ত মহিমার পথে নন্দিত করিবে।

আগা মোতাহার

পারস্যের ইস্পাহান নগরী বহুকালের। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের কিছু আগে এখানকার একজন অধিবাসী—মুহম্মদ মুজফ্ফর ব্যবসায়ে প্রচুর ধন উপার্জন করেন। তাঁহার পুত্র আগা মোতাহার যুবক। স্বদেশের সুযোগ-সুবিধায় তাঁহার সন্তুষ্টি হইল না। কোথায় গেলে ব্যবসায়ের বেশি সুবিধা হইবে, রাশি রাশি ধন আপনার ভাণ্ডারে আসিয়া জমিবে, ইহারই চিন্তায় তিনি মশগুল। কিন্তু তাঁহার বিবাহিত জীবন। স্ত্রী আনফাসুন্নিসা গর্ভবতী। কি করিয়া তাঁহার বিদেশ-গমন সম্ভব হইতে পারে? ভারতের ধনরত্নের কথা অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা দেশে পৌঁছিয়াছে; সেই জন্যই যুগে যুগে বিদেশ হইতে ধনরত্ন ও রাজ্যের লালসায় ব্যবসায়ী ও বিজেতারা এদেশে আসিয়াছেন। আগা মোতাহারের কানেও ভারতের খ্যাতি নানা রূপকথা উপকথার মধু মাখিয়া পৌঁছিয়াছিল; তিনি এই স্বপ্নের দেশে আসিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহিত জীবনে বাধা অনেক। তিনি আসিতে পারিলেন না। পত্নীর গর্ভে এক কন্যা জন্মিল; তাহার নাম রাখিলেন আজমউন্নিসা। সন্তানের মায়ায় বিদেশ গমনের কথা তিনি আপাতত ভুলিয়া গেলেন; ক্রমে কন্যা বড়ো হইয়া উঠিল; আগা মোতাহার বিবাহ দিলেন। তখন স্বদেশের বন্ধন তাঁহার আবার শিথিল হইয়া পড়িল। কিছুদিন পরে স্ত্রী আনফাসুন্নিসাও পরলোকগমন করিলেন। ইস্পাহানের কঠিনতম বন্ধনটি তিনি ইস্পাহানের মাটিতেই পুঁতিয়া রাখিলেন। শোকার্ত স্বামীর উদাস মন বিহঙ্গের মতো উড়িতে চাহিল। তিনি ভারতে চলিয়া আসিলেন। দিল্লীর তখ্‌তে তখন শাহানশাহ আওরঙ্গজেব।

আগা মোতাহার আত্মীয়-স্বজনদের না বলিয়াই স্বদেশ ছাড়িয়া আসিলেন। দিল্লীর রাজপাট তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। তিনি

সেখানেই রহিয়া গেলেন। পুনর্বার বিবাহের কথা তাঁহার মনেও আসিল না।

আগা সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান; সুশিক্ষা ও কর্মনিপুণতার জন্য তাঁহার প্রচুর খ্যাতি। বাদশাহের কানে তাঁহার গুণগ্রামের কাহিনী পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি আগা মোতাহারকে আপনার দরবারে ডাকিয়া লইলেন এবং খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং শেষে নদীয়া ও যশোহর জেলায় বিস্তর জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন।

এখানে চমৎকার একটি গল্প বলিবার আছে। কিন্তু এটি শুধু গল্পই। আগা মোতাহারের পত্নী স্বামীর সঙ্গে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন একটি বৃদ্ধ দরবেশ আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন: মা, তুমি মোহররমের শোক-উৎসব করিবে না? আগা পারস্যের অধিবাসী—শিয়া; তাঁহার পত্নীও শিয়া মতাবলম্বী। তিনি বৃদ্ধ দরবেশের প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিলেন না, শুধু চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। মোহররম পর্ব তাঁহার কতো প্রিয়; কিন্তু বাদশাহ্ নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান, তিনি, হয়তো মোহররম পর্ব পালনের অনুমতি দিবেন না; কারন তাঁহার চক্ষে ইহা ধর্ম্মসঙ্গত নয়। বৃদ্ধ বুঝিলেন: হয়তো এই জন্যই অসহায়া নারী অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। তখন তিনি গুরু-গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন: মা, তোমার স্বামীকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র এস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাও; অন্য কোনোখানে গিয়া মোহররম পর্ব প্রতিপালন কর। আগা মোতাহার পত্নীর পার্শ্বেই শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বপ্নাবেশে কাঁদিতে দেখিয়া আগা আশ্চর্য হইয়া গেলেন; স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি কাঁদিতেছ কেন, ব্যাপার কি? পত্নী তখন স্বপ্নের কথা সমস্তই স্বামীকে বলিলেন। স্বপ্ন-বিবরণ শুনিয়া আগা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। বাদশাহের অসন্তোষ, দরবেশের আজ্ঞা—ইহার কোনটিকে তিনি মানিয়া লইবেন? মীমাংসা কিছুই হইল না। শেষে বাদশাহ্ স্বয়ং ইহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। সম্রাজ্ঞীর মুখে আগা-পত্নীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইলেও বাহিরে সে-ভাব প্রকাশ করিলেন না, তাঁহার

প্রিয়-সভাসদের পত্নীকে নগরের বাহিরে গিয়া মোহররম উৎসব সম্পন্ন করিবার অনুমতি দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে আগা-মোতাহার বাদশাহের ইচ্ছায় হুগলীতে চলিয়া আসিলেন। বাদশাহ্ তাঁহাকে চিতপুর, যশোহর, ও নদীয়া জেলায় বহু সম্পত্তি দান করিলেন।

আরো একটি গল্প বলি।

বারাণসী-রাজ আগা মোতাহারের গুণপনার কথা শুনিয়া তাঁহাকে আপনার সভায় আহ্বান করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই আগা নিজের কৃতিত্ব ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিতে পারিলেন। বারাণসী-রাজ তাঁহার দক্ষতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহারই হস্তে সমস্ত রাজভার অর্পণ করিলেন। রাজার মৃত্যু হইলেও আগা মোতাহার সম্পূর্ণরূপে রাজকর্তৃত্ব পরিচালনা করিতে লাগিলেন, কেন না যুবরাজ তখনো নাবালক। যুবরাজের বয়ঃপ্রাপ্তির পর আগা তাঁহার হস্তে রাজভার অর্পণ করিয়া রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং হুগলীতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন।

রাজসভার সংশ্রব ছাড়িয়া ভারত-প্রবাসী পারসিক হুগলীতে আসিলেন। তাঁহার চিত্ত যেন নীড় হারাইয়া ফেলিল। পারস্যের ইস্পাহানী কুঞ্জে তিনি প্রিয়তমা পত্নীর রূপ-ঝলসিত অঙ্গ মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর আর বিবাহ করেন নাই। এখানকার নিঃসঙ্গ জীবন তাঁহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। দিল্লীতে তাঁহার কোনো পত্নী ছিল না, তাঁহার স্বপ্ন-দর্শনের কথা হয়তো সত্য নয়। কিন্তু বাদশাহ্ আগা মোতাহারকে সত্যই ভালবাসিতেন, এবং দিল্লীর রাজপাটের ছায়া ছাড়িয়া যখন তিনি প্রসিদ্ধ হুগলী নগরীতে চলিয়া আসিতে চাহিলেন তখন বাদশাহ্ তাঁহাকে বিস্তৃত ভূসম্পত্তি দান করিলেন। এই সম্পত্তি লইয়া তিনি কি করিবেন? ইস্পাহানে বসিয়া তিনি বিপুল ধনসম্পত্তি উপার্জনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; তাহার পর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর দেহত্যাগ ঘটিল। তিনি ভারতে চলিয়া আসিলেন, কতক স্বপ্নের মায়ায়, কতক বা উদাস মনের লক্ষ্যহীন ব্যাকুলতায়। দিল্লীতে তিনি সম্রাটের অনুগ্রহ পাইলেন, কাশীতে তিনি নরপতির রাজদণ্ড

স্বয়ং চালনা করিলেন ; কিছুতেই তাঁহার প্রাণ যেন সান্ত্বনা মানিল না। তিনি সব ছাড়িয়া শেষে হুগলীর তীরে হুগলী বন্দরে চলিয়া আসিলেন। এখান হইতে তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ চলিতে পারে।

হুগলী প্রসিদ্ধ বন্দর, বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতিতে বিপুল খ্যাতিসম্পন্ন। পর্তুগীজ বণিকেরা এখানে আডডা গাড়িয়াছিল। তাহাদের চেষ্টায় হুগলীর সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছিল। তাহারা সম্রাটের আদেশ লইয়া এখানে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল। এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিস্তৃতি সাধন করিয়া স্থানটিকে বিপুল বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত করিতেছিল। এসময় হুগলীর নাম ছিল ঘোলাঘাট। ঘোলাঘাটের পর্তুগীজেরা ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিল ; অবশেষে সম্রাট শাহজাহানের সহিত তাহাদের বিবাদ বাধিল। এই বিবাদ তাহাদের কাল হইল ; সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে তাহাদের শক্তি চূর্ণ হইয়া গেল। সপ্তগ্রাম হইতে রাজকীয় কাছারী আদালত প্রভৃতি সমস্তই এখানে চলিয়া আসিল ; হুগলী নদীর তীরে সুদীর্ঘ দুর্গশ্রেণী রচিত হইল ; নগরের নবনিযুক্ত শাসনকর্তা—ফৌজদার—সমারোহে হুগলীতে অধিষ্ঠান করিলেন। ফৌজদারের প্রাসাদ, সৈন্যদের আবাসদুর্গ, অন্যান্য সরকারী অট্টালিকায় শহর সুশোভিত হইল। হুগলী নদীতে ভাসমান তরণীমালা রাজআশ্রয়ে দেশ-বিদেশ হইতে পণ্য আনিল, লইয়া গেল। বাণিজ্যে, সম্পদে হুগলীর যৌবন যেন উথলিয়া উঠিল।

আগা মোতাহার এই সময়ে হুগলীতে আসিলেন। তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তির নিকটবর্তী এই নগরী ; অসংখ্য খ্যাতনামা রাজপুরুষ, বণিক ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের বাসভূমি এই নগরী। আগা এখানেই শান্তির আশায় চলিয়া আসিলেন। কিন্তু সংসারে তাঁহার মন বসিল কই? অনেক চিন্তার পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। তাঁহার নব পরিণীতা পত্নী দোরদানা খানম স্বামীর গৃহে আসিয়া সংসার পাতিয়া বসিলেন! তাঁহার চিত্তে কিছু শান্তি আসিল ; তিনি তাঁহার চিরপোষিত স্বপ্ন-সাধ মিটাইবার জন্য বিস্তৃত লবণের ব্যবসায় খুলিলেন।

মুন্নুজান

ভারতে আসিয়া আগা মোতাহারের জীবন এইভাবে নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিকশিত হইতেছিল। ওদিকে ইস্পাহানে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা ঘোর দুর্ভাবনার মধ্যে কাল কাটাইতেছিলেন। প্রিয় পত্নীর দেহ সমাহিত করিয়া আগা নীরবে স্বদেশ ছাড়িলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। আত্মীয়-বন্ধুরা প্রথমে ভাবিয়াছিলেন: শান্তির আশায় আগা কিছুদিনের জন্য হয়তো কোথাও গিয়া থাকিবেন; কিন্তু যখন অনেক দিন কাটিয়া গেল তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

স্বপ্নের দেশ ভারতে আসিয়া বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা আগা মোতাহারের ছিল; ইহা তাঁহার আত্মীয়দের কেহ কেহ জানিতেন। তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া আগার দেশত্যাগের কথা আলোচনা করিলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সকলেই স্থির করিলেন; আগা নিশ্চয়ই ভারতে চলিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ; কোথায় গেলে আগা মোতাহারের সন্ধান মিলিবে, ইহা এক বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আগার সন্ধান তো করিতেই হইবে; বসিয়া ভাবিলে চলিবে না। আগা ফজলুল্লাহ তাঁহার ভগিনীপতি; মোতাহারের খোঁজে তিনি নিজে আসিলেন, পুত্র হাজী ফয়জুল্লাহকেও লইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন আকা মুহম্মদ কাদির, হাজী মুহম্মদ করীম ও হাজী আলাবর্দী। তাঁহারা প্রথমে দিল্লীতে গেলেন। কিন্তু আগা মোতাহারের স্বদেশে ফিরিবার বাসনা ছিল না। তিনি আত্মীয়দের হাত এড়াইবার জন্য বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের অনুমতি লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিলেন এবং বারাণসীর বৃদ্ধ রাজার আহবানে তাঁহার হইয়া রাজ্য পরিচালনার ভার

লইলেন। যুবরাজের বয়ঃপ্রাপ্তির তখন অধিক বিলম্ব নাই; কিন্তু বৃদ্ধ রাজা আগার গুণপনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই হাতে পুত্রের রাজকীয় কর্তব্য শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন।

ওদিকে আগা মোতাহারের আত্মীয়-স্বজনেরা দিল্লীর রাজসভার সভাসদগণের মুখে তেমন কোনো সংবাদ জানিতে না পারিয়া বাহিরের লোকের কাছে সংবাদ জানিতে লাগিলেন। শেষে বারাণসীর কথা তাঁহারা জানিতে পারিলেন। কিন্তু তাঁহারা বারাণসীতে আসিবার পূর্বেই আগা হুগলীতে আসিয়া সংসার পাতিলেন, ব্যবসা জমাইয়া বসিলেন; এখন তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমন অসম্ভব।

আত্মীয়েরা হুগলীতে আসিয়া দেখিলেন: সত্যই আগা মোতা-হারের পক্ষে স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। বাদশাহ তাঁহাকে বিস্তৃত জায়গীর দিয়াছেন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে; তিনি স্বয়ং বিরাট কারবার ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। নূনের বড়ো কারবার ব্যাপার বড়ো সহজ নয়। সেজন্য অনেক সাবধান ও বিশ্বস্ত চক্ষুর প্রয়োজন। আত্মীয়েরা হুগলীতে পৌঁছিলে আগা তাঁহাদের সাদরে গ্রহণ করিলেন; স্বদেশে ফিরিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদেরই বরং হুগলীতে বসবাস করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন: আগার মতো বণিকের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইলে তাঁহারাও প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে পারিবেন। আগার অনুরোধ রক্ষিত হইল, আত্মীয়েরা তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হাজী ফয়জুল্লাহ প্রথমে মুর্শিদাবাদে, পরে সুদূর সুরাটে কার-বারের তদারক করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। আগা মোতাহার ধন-জন পরিবেষ্টিত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কিন্তু ধনসম্পত্তি, লোকজন আত্মীয়-স্বজন মানুষকে সুখ দিতে পারে না। আগার বিরাট অর্থ-সম্পত্তি, তাঁহার মৃত্যুর পর এ-সব ভোগ করিবে কে? লোকান্তরিত প্রথম পত্নীর গর্ভজাত কন্যার বিবাহ ইস্পাহানেই দিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর এখানে আসিয়া তিনি দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কোনো সন্তান হইল না। আগা মনের দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিতে লাগিল।

অবশেষে বন্ধুদের অনুরোধে আগা মোতাহার তৃতীয় পত্নীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই পত্নীর নাম—জয়নাব খানম্।

কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ। দোরদানা খানম্ ও জয়নাব খান্ম—দুই স্ত্রী লইয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। নবপরিণীতার গর্ভে হয়তো পুত্র-সন্তান জন্মিবে এই আশায় তিনি বুকে আবার বল পাইলেন, সংসারের দিকে আবার মন দিলেন। কিন্তু আশা তাঁহার পূর্ণ হইল না। বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল, সন্তানের মুখ তিনি দেখিতে পাইলেন না। একজন মানুষের জীবনে তিন তিন বার পত্নী গ্রহণ—বিশেষত একটি বাঁচিয়া থাকিতে আর একটি পত্নী গ্রহণ—বাঞ্ছনীয় ব্যাপার মোটেই নয়। আগা মোতাহার বড়ো আশায় বুক বাঁধিয়া তাহাও করিয়া দেখিলেন। কিন্তু সুখশান্তি তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। সন্তানের মুখ তিনি দেখিলেন না। এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হইল পরিবারে সপত্নীকলহ। আগা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

বন্ধুরা বলিলেন: ভাই, তুমি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ কর। আগা মোতাহার অগত্যা তাহাই করিলেন! পোষ্যপুত্রটির নাম—মুহম্মদ রেজা। দরিদ্রের তনয় ধনীর দুলাল হইল, তাহার আদর যত্নের সীমা নাই। দাসদাসীরা সবাই রেজার জন্য ব্যস্ত তাহার কখন কি প্রয়োজন হয়, কখন কোন বিষয়ে তাহার অভিরুচি জন্মে ইহারই তত্ত্ব লইতে তাহারা সকলেই উৎসুক। আগা দিন দিন এই বালকের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন; পরকে আপন ভাবিয়া তাহার শিক্ষাদীক্ষা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যতো-কিছু ব্যবস্থা অর্থের বিনিময়ে মিলিতে পারে, সব-কিছুই করিলেন। মুহম্মদ রেজা তাঁহার প্রাণের ধন, নয়ন-পুত্তলি। তাহার জন্য আগা মোতাহার খালেসপুর (হুগলী) ও আজিমাবাদে বাগবাগিচা ও বাটিকা নির্মাণ করিলেন। পুত্রের বয়স বাড়িতে লাগিল; নূতন নূতন বাড়িও তাহার জন্য তৈরী হইতে লাগিল। খিজিরপুর, পাইকপাড়া, বালুচা, কাটাগঞ্জ (নদীয়া), সোনাডাঙ্গা (বর্ধমান) ইমামনগর (মুর্শিদাবাদ) ও হুগলীতে পুত্রের আনন্দনিবাস নির্মিত হইল। কিন্তু পুত্রটির মতিগতি খুব ভালো হইল না। নানা কারণে ক্রমে ক্রমে আগা মোতাহার তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িলেন।

বার বার আশায় ছাই পড়িলে মানুষের মন আর কতোদিন স্থির থাকিতে পারে? ইস্পাহানে তাঁহার একমাত্র সন্তান—কন্যা—বাস করিতেছে। এতদূর হইতে তাহার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ভারতে আসিয়া তিনি পর পর দুইবার বিবাহ করিলেন; কিন্তু কোন ফল ফলিল না। পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন; তাহাকে পুত্রের মতো স্নেহ দিলেন; তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-বিলাস বিপুল অর্থ ব্যয়ে সমস্তেরই আয়োজন করিলেন, কিন্তু তাহার মতি-গতি ভালো হইল না। এতোবারের ব্যর্থ আশা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। আগা মোতাহার এবার সংসার ত্যাগ করিবেন, ফকিরী গ্রহণ করিয়া তপস্যায় জীবন কাটাইবেন। বয়স তাঁহার যথেষ্ট হয়েছে; সংসারের মায়ায় ঘুরিয়া দেখিলেন: কোনো ফললাভ হইল না; এইবার দরবেশের জীবন তিনি অবলম্বন করিবেন।

আগার অন্তরের নিভৃত কোণে তাঁহার এই বাসনা আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। পরিবারে শান্তি নাই, সেখানে অনবরত কলহ লাগিয়াই আছে। বিষয়-বিষ ত্যাগ করিয়া গৃহের কোণে আসিয়া আশ্রয় লইবেন সেখানেও তাঁহার সুখ নাই। তবে কোন্ সুখের আশায় তাঁহার সংসার? পুত্র না হোক, একটি কন্যাও যদি তাঁহার গৃহে জন্মিত, তাহার মুখ তাকাইয়া আগা সকল দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? সত্যই এ সংসারে আগার আর প্রয়োজন নাই, তিনি দরবেশী গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু দরবেশী তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল না। অন্য অন্য বারের মতো এবারও তাঁহার বৈরাগ্যে বাধা জন্মিল। বার্ধক্যের মুখে একটা সন্তান আসিয়া তাঁহার গৃহ আলোকিত করিল, তৃতীয় পত্নী জয়নাব খানম্ একটি কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যার নামকরণ হইল—মরিয়ম খানম্। বৃদ্ধ আগা আদর করিয়া কন্যাকে মন্নুজান বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এতোদিন পরে বৃদ্ধের বিরাগী মন সংসারে একটা আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল, কন্যাকে তিনি পুত্রের অধিক স্নেহে যত্নে লালন করিতে লাগিলেন।

এখন হইতে মনুজানই হইল আগা মোতাহারের জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ। কন্যাকে তিনি মুহূর্তের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। দোরদানা খানম্ বাঁচিয়া থাকিতেই তিনি তৃতীয় পত্নী—জয়নাব খানম্‌কে বিবাহ করিয়াছিলেন, কাজেই দোরদানার প্রতি তেমন ভালবাসা তাঁহার ছিল না। জয়নাব খানম্ কলহপ্রিয়া, স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বলিয়া কর্তৃত্বের অধিকারে অহঙ্কৃতা, তাই জয়নাবের কাছে আসিয়াও আগার সুখ ছিল না। তাঁহার অন্তরের ভালবাসা পোষ্যপুত্রের উপর পড়িতে চাহিতেছিল কিন্তু সেখান হইতেও তাহা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল। এখন কন্যাকে পাইয়া তিনি হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিলেন, অন্তরের সমস্ত ভালবাসা প্রীতি স্নেহ অজস্র ধারে মনুজানের উপরে আসিয়া পড়িল। মনুজান বুদ্ধিমতী, রূপবতী, স্নেহশীলা। কন্যার প্রতি বৃদ্ধ পিতার অনুরক্তি ক্রমেই গভীর হইতে লাগিল। জয়নাব খানম্ দেখিলেনঃ আগা যে-ভালোবাসা তাঁহাকে দিতে পারেন নাই, আজ তাঁহার কন্যার প্রতি সেই ভালোবাসা মুক্তচিত্তে বিতরিত হইতেছে। ইহাতে তিনি সুখীও হইলেন, দুঃখিতও হইলেন। সুখী হইলেন, কেননা তাঁহারই গর্ভজাত কন্যা পিতার আদরিণী হইয়াছে, দুঃখিত হইলেন, কেননা আগা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে এতো ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। কন্যার আদরে তিনি সুখী হইলেন, কিন্তু আগা মোতাহারের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল।

মুনুজানের বয়স বাড়িতে লাগিল, পাঁচ গেল, সাত গেল, দশে আসিয়া পড়িল। কৈশোরের স্নিগ্ধ রূপে তাহার অঙ্গ ভরিয়া গেল, বুদ্ধি-স্নেহ-সেবায় তাহার চিত্ত পরম সুন্দর হইয়া উঠিল। আগা মোতাহার কন্যার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে চাহিয়া আপনাকে ভুলিয়া গেলেন, সংসারের সুখ যেন তাঁহার ষোলো কলায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এগারো বৎসরের পর আগা মোতাহার একদিন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ মা, তোমার গলায় আমি এই মাদুলিটি পরাইয়া দিতেছি, ইহার মূল্য অনেক ; আমার মৃত্যুর পূর্বে ইহা কখনো ভাঙিও না। মন্নুজান বালিকামাত্র, কিন্তু বুদ্ধি তাহার অসাধারণ। পিতার ইচ্ছা তাহার কাছে আদেশের চেয়েও মূল্যবান। কেহ মাদুলিটা ছুঁইতে আসিলেও মন্নুজান তাহাতে আপত্তি করিতে লাগিল। ইহার পর হইতে জয়নাব খানম্ স্বামীর প্রতি আরো বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল ঃ হয়তো এই মাদুলির মধ্যে আগা এমন কোনো ব্যাপার ঘটাইয়া গেলেন, যাহাতে তাঁহার অনিষ্ট হইবে। কিন্তু ইহার প্রতীকারের কোনো চেষ্টাই তিনি করিলেন না। স্বামী যাহা ইচ্ছা হয় করুন, আমার তাহাতে কিছু আসে যায় না—এই মনোভাব তাঁহাকে পাইয়া বসিল। কন্যা পিতা দুজনেই তাঁহার ঔদাসীন্য ও উপেক্ষার পাত্র হইয়া পড়িলেন।

পত্নীর এই উপেক্ষা ঔদাসীন্য আগা মোতাহারকে স্পর্শ করিতে পারিল না। কন্যাকে ঘিরিয়া তাঁহার যে-নূতন জগৎ রচিত হইয়াছিল, সেখানেই জীবনের শেষ কয়টি দিন তাঁহার আনন্দে কাটিয়া গেল। মন্নুজানের বয়স বারো বৎসরে পড়িয়াছে, এমন সময় একদিন আগা মোতাহার সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া —স্নেহময়ী কন্যাকে ফেলিয়া রাখিয়া পরপারের যাত্রী হইলেন।

মন্নুজান কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেন, আত্মীয়-স্বজন শোকে অধীর হইলেন ঃ বিস্তৃত ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধানকারীরা হতাশ নিরবলম্ব হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শোকের আঘাত মানুষকে আহত করিলেও একেবারে মারিয়া ফেলে না। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস কমিয়া গেলে সকলে একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন, মন্নুজানের মূল্যবান মাদুলি ভাঙিয়া দেখা হইল ঃ আগা মোতাহার কন্যাকে তাঁহার সমস্ত অর্থ-সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, ভাগিনেয় হাজী ফয়জুল্লাহকে ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব দিয়া গিয়াছেন। হাজী ফয়জুল্লাহ তখন সুরাটে নুনের কারবার লইয়া আছেন। বাঙলা দেশ হইতে সে অনেক দূরের পথ, আসিয়া পৌঁছিতে বেশ কিছুদিন লাগিবার কথা। আগা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ঃ যতদিন হাজী ফয়জুল্লাহ্ সুরাট হইতে না পৌঁছিবেন ততদিন

হাজী আলাবক্দী তাঁহার ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করিবেন। স্ত্রীর জন্য আগা কোনো ব্যবস্থাই করিয়া যান নাই। ইহাতে জয়নাব খানমের ক্ষুব্ধ অভিমান শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। তিনি কিরূপে আগা মোতাহারের কথা অন্তর হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারেন তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আগা স্ত্রীর জন্য কিছু রাখিয়া যান নাই, ইহাতে জয়নাব খানম ক্ষুব্ধ মর্মাহত হইলেন, কিন্তু স্বামীর দানপত্র কৃত্রিম বা অযথা প্রমাণ করিবার জন্য একটুও ব্যস্ত হইলেন না। কেহ তাঁহাকে সেরূপ উপদেশ দিলেও হয়তো তিনি তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেন। আগা তাঁহাকে জীবনে ভালো-বাসিলেন না, মৃত্যুর পর তাঁহার অর্থ-সম্পত্তি জয়নাব খানম্ ভোগ করিবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না। আগা মোতাহার তাঁহাকে সম্পত্তি দিয়া গেলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন কি না সন্দেহ। জয়নাব খানম্ কেন এমন প্রেমহীন স্বামীর দান গ্রহণ করিবেন? তাঁহার পৈতৃক উত্তরাধিকার বড়ো অল্প নয়, অনেক অর্থ-সম্পত্তি তাঁহার নিজের অধিকারে রহিয়াছে। অন্যের বিষয়-বৈভব না হইলে কি তাঁহার চলিবে না?

তথাপি আগা মোতাহার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সম্বন্ধে কোনো-রূপ চিন্তা না করায় জয়নাব খানম্ ব্যথিত হইলেন। সম্পত্তির প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য দুইটি স্নেহমমতার কথাও কি আগা মোতাহার দানপত্রে লিখিয়া যাইতে পারিলেন না? তুলার মহাজন জাফর পান্নার নিকট হইতে আগা বিরাট বাড়ি কিনিয়া সেখানে ইমামবাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন, প্রতি বৎসর সেখানে মহাসমারোহে মোহর্‌রম পর্বাহ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার কামনা। তাছাড়া তাঁহার নিজের বাসের জন্যও বাড়ি তৈরী হইয়াছিল। এ-সমস্ত তাঁহার কন্যা মন্নুজান (মরিয়ম খানম্) ভোগ করুন, মাতার তাহাতে লাভ না হোক, অন্তত লোকসান কিছুই নাই। কিন্তু বিবাহিত জীবনের কি এই প্রতিফল যে, স্বামী মৃত্যুর পূর্ব্বে স্ত্রীর কথা মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দিবেন না? জয়নাব খানম্ স্বামীর এই ব্যবহারের প্রতিশোধ দিতে কি একেবারেই অক্ষম?

কয়েক মাস পরে হাজী ফয়জুল্লাহ সুরাট হইতে আসিয়া মাতুলের যতো কিছু কারবার, সমস্তের তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। হাজী ফয়জুল্লাহ আগা মোতাহার অপেক্ষা বয়সে অল্প, সুন্দর সুপুরুষ, গুণপনায়ও তিনি মাতুলের চেয়ে কোনো অংশে কম নন। রাজসভায় তিনি গেলেন না, রাজার হইয়া রাজদণ্ড তিনি চালনা করিলেন না, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতর দিয়াই আপনার শক্তিকে তিনি বিকশিত করিয়া তুলিলেন। জয়নাব খানম্ ইহাতেই পরম প্রীত হইয়া উঠিলেন। আগা মোতাহারের প্রতি বিতৃষ্ণা তাঁহার অন্তরের সমস্ত কোমলতা যেন শুকাইয়া ফেলিয়াছিল, হাজী ফয়জুল্লার রূপ গুণ কৃতিত্ব ও সহানুভূতিতে আবার তাহা জাগিয়া উঠিল। হাজী ভাগিনেয়—একথা আর বড়ো হইয়া তাঁহার মনে স্থান পাইল না। হাজী সুন্দর সুপুরুষ, গুণ তাঁহার প্রচুর, কৃতিত্ব তাঁহার অসাধারণ, সহানুভূতি তাঁহার অসীম—জয়নাব খানম্ শুধু ইহাই দেখিতে পাইলেন। এইবার আগাকে ভুলিবার উপযুক্ত অবসর। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া হাজী ফয়জুল্লাহকে স্বামিত্বে বরণ করিলেন।

হাজী ফয়জুল্লার অনুদার ছিল না। তিনি পত্নীর সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। জয়নাব খানম্ এতোদিন পরে সুখের সন্ধান পাইলেন। তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন শান্তিময় মধুময় হইয়া উঠিল। জয়নাব খানমের এই নূতন সংসারের মধু-পাদপের অমৃতময় ফল মুহসিন! হাজী ফয়জুল্লাহ বিবাহের অল্পদিন পরে পুত্র-সন্তান লাভ করিলেন। জয়নাব খানমের আজ আনন্দের দিন। সকলেরই মুখে আজ আহ্লাদের চিহ্ন। হাজী মুক্তহস্তে ধন বিতরণ করিলেন, জননী জয়নাব চোখের জলে আল্লার দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, কিশোরী মন্নুজান খুশির বন্যায় ভাসিয়া গেলেন। মন্নুজান সংসারে ছিলেন একাকী, মাতার স্নেহ তিনি প্রাণ ভরিয়া পান নাই, পিতার অপরিসীম স্নেহ তাঁহার বারো বৎসরের মধ্যেই ফুরাইয়া গেল। তাই এতো মানুষের মধ্যেও নিঃসঙ্গ তাঁহার জীবন। এই জীবনের একাকিত্ব ঘুচাইয়া মুহ্সিন আসিলেন। মন্নুজানের নিঃসহায় স্নেহ একটী আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল।

মন্নুজান ও মুহ্সিন

হুগলীতে মুহসিনের জন্ম হইল ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে। বাঙ্গলার মুসলিম রাজশক্তি তখন পূর্ণ গৌরবের চূড়ায় সমাসীন। মুর্শীদকুলি খাঁর সাধের রাজধানী মুর্শীদাবাদ ধনে-জনে, বিষয়-বৈভবে, ব্যবসাবাণিজ্যে, শিক্ষা-সভ্যতায় বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। মুর্শীদাবাদের এই সৌভাগ্য দেখিয়া বিধাতা বোধ হয় মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন; কারণ ইহার ২৭ বৎসর পরেই পলাশীর আম্রকাননে ইংরাজের সহিত যুদ্ধে চিরদিনের জন্য মুসলিম রাজশক্তির পতন ঘটিল। প্রদীপ নিভিবার পূর্বে যেরূপ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, বাঙ্গলার নবাবের রাজশক্তিও তখন সেইরূপ ভাস্কর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই আলোকে মুহম্মদ মুহ্সিন বিধাতার আশীর্ব্বদরূপে জগতে নামিয়া আসিলেন। ইংরাজ এতো শীঘ্র বাঙ্গালার ভাগ্য-বিধাতা হইবেন, একথা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই কেননা মুসলিম সভ্যতা, মুসলিম শিক্ষাপদ্ধতি, মুসলিম সামরিক শক্তি সমস্তেরই তখন পূর্ণ অধিকার। ইংরাজ বণিক-বেশে সুতানটীতে আড্ডা গাড়িয়াছেন, তাঁহাদের বাণিজ্য বাঙ্গালায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তঁহারা নিজেদের অর্থ-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিয়াছেন—ইহাকে কেহ সন্দেহের চক্ষে দেখে নাই, কেহ মনে করে নাই এইটুকু অধিকার এতো শীঘ্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধিকারে পরিণত হইবে। কেননা নবাবী আমলের কোনোরূপ ভীষণ দুর্বলতা তখনো পর্যন্ত কেহ বুঝিতে পারে নাই। সকলেই ছিল যেন এক সুখস্বপ্নে বিভোর। এই স্বপ্নের মায়ার মাঝখানে মুহম্মদ মুহ্সিন আসিয়া দেখা দিলেন।

মাতার গভীর স্নেহ হইতে বঞ্চিত মন্নুজান মুহ্সিনকে আকাশের চাঁদের মতো হাতে পাইলেন। কিশোরীর চিত্ত ভরিয়া

যে-প্রীতি লোকদৃষ্টির অন্তরালে উচ্ছলিত হইতেছিল, যে-ভালোবাসা যৌবনের রঙিন সম্ভাবনার মৃদু তরঙ্গে হিল্লোলিত হইতে শুরু করিয়াছিল, তাহার সমস্তটুকু শিশু মুহ্‌সিনের উপরে আসিয়া পড়িল। মুহ্‌সিন তাঁহার পিতার ঔরসজাত সন্তান নন, একথা মন্নুজানের মনে আসিল না; তাঁহারই জননীর গর্ভজাত এই শিশু—তাঁহারই একটি ভ্রাতা সংসারে শান্তি সুখ কোমলতার আগমন-পথ রচনা করিতে করিতে তাঁহার কোলে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাই তিনি সমগ্র অন্তর দিয়া ভাবিলেন; তাঁহার দুইটি চক্ষু ভরিয়া মুহ্‌সিন এই প্রীতিসুন্দর রূপেই আসিয়া দেখা দিলেন।

শিশু মুহ্‌সিন মন্নুজানের স্নেহ-উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে দিন দিন শশিকলার মতো বাড়িতে লাগিলেন। ভাষাহীন শিশুর অস্ফুট কাকলি ভগিনীর কর্ণে মধুবর্ষণ করে, প্রতি অঙ্গক্ষেপ তাঁহার চোখে মুখে তৃপ্তির মায়া বুলাইয়া দেয়। ভাইটি যখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাঁদিয়া ওঠে, মন্নুজানের অন্তর দরবিগলিত ধারে শিশুর উপরে নামিয়া আসে; তাহাকে জননীর অধিক যত্নে কোলে লইয়া তিনি আদর করেন, জয়নাব খানমের কাছে ক্ষণিকের জন্য লইয়া যান।

তারপর ক্রমে মুহ্‌সিনের কথা ফুটিল, হাঁটিবার শক্তি জন্মিল। মন্নুজান অনুক্ষণ তাহার সঙ্গিনী, রক্ষাকর্ত্রী। শৈশব গেল; বাল্য আসিল। মন্নুজানের স্নেহ-প্রীতি মুহ্‌সিনের উপরে সহস্রধারে উচ্ছলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। ভগিনীর আদরে ভালোবাসায় মুহ্‌সিন ডুবিয়া রহিলেন। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। দিবারাত্র মন্নুজান মুহ্‌সিনের একত্র বাস, একত্র শয়ন, একত্র আহার, একত্র সবকিছু চলিতে লাগিল। হাজী ফয়জুল্লাহ্ ও জয়নাব খানম্ ভাই-ভগিনীর মধ্যে এইরূপ গভীর স্নেহ-প্রীতির বন্ধন রচিত হইতে দেখিয়া পুলকিত হইলেন। মন্নুজান তাঁহার ঔরসজাত কন্যা নহেন, একথা ফয়জুল্লাহ্ ভুলিয়া গেলেন; আগা মোতাহার তাঁহার উপর সুবিচার করিয়া যান নাই, জয়নাব খানমও ইহা বিস্মৃত হইলেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ভাইবোন স্নেহ-প্রীতির মায়ায় সম্পূর্ণ এক হইয়া গেল।

মন্নুজানের গৃহ-শিক্ষা আগে হইতেই শুরু হইয়াছিল। ওস্তাদ—আগা শিরাজী। তিনি পারস্য হইতে আসিয়া এদেশে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মন্নুজানের চিত্তকে অত্যন্ত যত্নের সহিত গঠন করিতেছিলেন। স্নেহ দয়া মায়া প্রীতির দ্বারা দুঃখের সংসার কি ভাবে মধুময় করিয়া তোলা যায়, পরকে আপনার করিয়া, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করিয়া কি ভাবে জগতকে ভালোবাসায় বাঁধিতে পারা যায়, সমাজের কুটিল চক্র ভেদ করিয়া কি ভাবে আত্মরক্ষা অর্থরক্ষা সম্ভ্রমরক্ষা করিতে পারা যায়, সুপণ্ডিত আগা এ সমস্তই তাঁহার বুদ্ধিমতী ছাত্রীকে ধীরে ধীরে শিখাইতেছিলেন। সেই সময় মুহ্সিন আসিয়া মন্নুজানের কোল জুড়িয়া, চিত্ত অধিকার করিয়া বসিলেন। ভগিনী ভাইকে স্নেহ দিলেন, প্রীতি দিলেন, আদর যত্ন ও সেবায় লালন করিলেন। তারপর মুহ্সিনের শিক্ষার সময় শুরু হইলে আপনার অন্তরের মণিমাণিক্য দিয়া ভাইয়ের অন্তর শোভিত করিতে লাগিলেন; আগা শিরাজীর পদপ্রান্তে দুই ভাইবোনে মিলিয়া বিদ্যা ও নীতির চর্চা শুরু করিয়া দিলেন।

ভগিনীর অন্তরের উদারতা কোমলতা মুহ্সিনের অন্তরে আসিয়া বাসা বাঁধিতে লাগিল। আগা শিরাজীর যত্নে, শিক্ষার আলোকে তাহা আরো বাড়িয়া চলিল। ভাই-বোনের এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক মতিগতি, একই কল্যাণ-বুদ্ধি। ওস্তাদ ইহা দেখিয়া মনে মনে বিস্ময় মানিলেন। বিধাতাকে ডাকিয়া বলিলেন: খোদা, দয়াময়, তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় এই ভাইবোনের স্নেহপ্রীতিতে জগৎ মধুময় হইয়া উঠুক। বিধাতা বোধ করি ওস্তাদের এই প্রার্থনা শুনিয়া ছিলেন; তাই পরবর্তী কালে মন্নুজান ও মুহ্সিনের স্নেহের বন্ধন মানুষের অশেষ কল্যাণের কারণ হইয়াছিল।

এইভাবে প্রীতির মধুময় আনন্দে, সকল শুভসম্ভাবনার আবেষ্টনে মুহম্মদ মুহ্সিনের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইল। সেকালে বিদ্যালয়ে আরবী পারসী ভাষা, কোরআন হাদিস প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র এবং ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বীজগণিত প্রভৃতি সাধারণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। আগা শিরাজী প্রচলিত পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীর

সুশিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সুপণ্ডিত আগা শুধু বই পড়াইয়াই কোনদিন খুশি থাকিতেন না; তিনি মুখে মুখে ছাত্র-ছাত্রীকে জ্ঞানগর্ভ নীতিকথা শিখাইতেন, দেশ-বিদেশের কেচ্ছা-কাহিনী বলিতেন, তিনি নিজে কিভাবে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গহন বন, বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া—দস্যুর উপদ্রব, বন্য পশুর আক্রমণ ভয়, দুঃসহ রোগকষ্ট প্রভৃতি কত-কিছু আপদ-বিপদ তুচ্ছ করিয়া—আবার কতো অজ্ঞাত জনের স্নেহের আস্বাদ পাইয়া পারস্য হইতে ভারতে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহার রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত করিতেন। মন্নুজান-মুহসিন অবাক হইয়া সমস্ত শুনিতেন, ওস্তাদের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সংগে সংগে তাহাদের বুকের মধ্যে চলিয়া যাইত, কত অজ্ঞাত আশংকায় তাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, কত স্বপ্নরঙিন আশার ইঙ্গিতে তাঁহাদের হৃদয় নৃত্য করিত। ওস্তাদ তাহা লক্ষ্য করিয়া পুলকিত হইতেন এবং দুইটি তরুণ হৃদয়কে তিনি শিল্পীর কৌশল দিয়া রচনা করিতেছেন ভাবিয়া গৌরব অনুভব করিতেন।

সুপণ্ডিত ওস্তাদ আগা শিরাজীর হাতের মুঠার মধ্যে এইভাবে দুইটি জীবন গঠিত হইতেছিল। মন্নুজান গৃহে থাকিয়া যতটুকু সম্ভব বিদ্যা অর্জন করিলেন, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলার উপযুক্ত যাবতীয় গুণপনার অধিকারিণী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিদ্যা-অর্জ্জন ও দেহমন-গঠনে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ভগিনীর স্নেহচ্ছায়ার তলে তাঁহার যত কিছুই সদগুণ সমস্তই মুহ্‌সিনের অন্তরে আসিয়া সঞ্চিত হইতে লাগিল। আরবী পারসী ভাষা শিক্ষায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইলেন, হস্তলিপি রচনা প্রভৃতিতে তাঁহার অপূর্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। গুরু তাঁহার নিকট হইতে যতটুকু আশা করিয়াছিলেন, সমস্তই সম্পূর্ণরূপে ফলিয়া গেল।

মুহম্মদ মুহসিনের মানসিক গুণের বিকাশ এইখানেই সমাপ্ত হইল না। সেকালে গীতবাদ্য অত্যন্ত আদরের সামগ্রী ছিল। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের অধিকাংশ লোকই কোন-না-কোন ওস্তাদের কাছে কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন। এ-বিষয়ে

যিনি কৃতী হইতে পারিতেন, সমাজে তাঁহার আদর হইত, সম্ভ্রম হইত, ধনী, জ্ঞানী, গুণী সকলেই তাঁহাকে তসলিম করিতেন। এইজন্য বিখ্যাত সঙ্গীত-সাধকেরা রাজধানী ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শহরে নিযুক্তির আশায় সমবেত হইতেন এবং আমীর-ওম্‌রাহ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আহূত মজলিসে আপনাদের গুণপনা প্রকাশ করিতেন। মুহম্মদ মুহ্‌সিনও এইরূপ একজন গুণীর সাহায্য পাইলেন। নাম তাঁহার ভোলানাথ ওস্তাদ। গীত-বাদ্যে তাঁহার মতো অসাধারণ কৃতিত্ব হুগলীতে তখন আর কাহারও ছিল না। মুহসিন নিবিষ্ট মনে ওস্তাদ ভোলানাথের কাছে গান শিখিলেন, বাজনা শিখিলেন। সেতার বাজাইতে তিনি এতই পটু হইলেন যে, তাঁহার প্রশংসা চারিদিকে কীর্তিত হইতে লাগিল। ভগিনী মন্নুজানও গান শিখিলেন, বাজনা শিখিলেন। দুই ভাই বোনে মিলিয়া কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের সাধনায় মজিয়া গেলেন।

সঙ্গীত সাধনাতেই মুহসিনের প্রয়োজন মিটিল না। তখনো বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্রগৌরবরবি অস্তমিত হয় নাই, তখনো স্বদেশের প্রত্যেকটি যুবক শত্রুর বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হওয়া জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করিতেন। তাই সঙ্গীতের সাধনায় ভাইবোনে মশগুল হইয়াও মুহ্‌সিনের দেহ-চর্চার প্রয়োজন চলিয়া গেল না। তিনি অশ্বারোহণ শিক্ষা করিলেন, অস্ত্রচালনা শিখিলেন, কুস্তিতে দক্ষতার পরিচয় দিলেন। প্রত্যহ সূর্য উঠিবার পূর্বে তিনি পাঁচ ছয় মাইল পথ পায়্‌দল্‌ চলিয়া যাইতেন, পথের শেষ প্রান্ত হইতে আবার ফিরিয়া আসিতেন। অস্ত্র-নির্মাণের জন্য লৌহকারের কাজ শিখিয়া রাখাও তিনি দরকার মনে করিলেন। সেলাইয়ের কাজও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না। মন্নুজান ভাইয়ের যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখিয়া অন্তরে অসীম আনন্দ অনুভব করিলেন।

এইভাবে হুগলীতেই মুহম্মদ মুহ্‌সিনের জীবন গঠিত হইয়া উঠিল ; যে-মহান ব্রত উদযাপনের জন্য বিধাতা তাঁহাকে মরজগতে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি তাহার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু হুগলীতে তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল না। মুর্শীদাবাদই ছিল তখনকার দিনে বাংলার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। সেখানে যাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। মন্নুজান জানিতেন: তাঁহার অতি স্নেহের ভাই একদিন তাঁহাকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইবেন; সেজন্য তিনি মনে মনে প্রস্তুতও হইতেছিলেন। কিন্তু সত্য সত্যই যখন সে দিন ঘনাইয়া আসিল তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। মুহ্‌সিন তাঁহার সম্মুখে থাকিবেন না, হুগলী হইতে মুর্শীদাবাদ চলিয়া যাইবেন, ইহা যতই কঠোর হইতে কঠোরতর সত্যরূপে তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তিনি ততই অধীর হইতে লাগিলেন। শেষে যেদিন মুহসিন মুর্শীদাবাদ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, মন্নুজান কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেন। বিদুষী নারীর হৃদয় বুদ্ধির সান্ত্বনা মানিল না, স্নেহের টানে আপনাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিল। মুহ্‌সিনের চোখেও অশ্রুর জোয়ার জাগিয়া উঠিল। যে ভগিনীর অসীম স্নেহ পাইয়া তিনি এত বড় হইয়াছেন, তাঁহার চোখে জল দেখিয়া বিদায় মুহূর্তে তিনিও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তথাপি মুর্শীদাবাদ তাঁহাকে যাইতেই হইবে। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য হুগলী এখন আর যথেষ্ট নয়। মন্নুজান কাঁদিতে কাঁদিতে ভাইয়ের সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া দিলেন, মুহ্‌সিনও কাঁদিতে কাঁদিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া উদ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিলেন। যত দূর দৃষ্টি গেল, ভগিনী প্রবাসযাত্রী ভ্রাতার গতিপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন; মুহ্‌সিন যখন দূরে গেলেন মন্নুজান ছাদে উঠিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। তরুলতার বাধা তাঁহার স্নেহ-ব্যাকুল দৃষ্টিকে প্রতিহত করিতে লাগিল, চোখের জলে পথযাত্রী মুহ্‌সিনের ছবি আরো অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ভ্রাতার ছবি যখন দিগন্তের বন রেখায় মিলাইয়া গেল, তখনও মন্নুজান শূন্য যাত্রা-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার হাত দু'খানি যুক্ত হইয়া উপরে উঠিল। তিনি অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠে খোদাকে ডাকিয়া বলিলেন: সকল মঙ্গলের মালিক তুমি খোদা, আমার ভাইয়ের প্রবাস-গমন যেন সার্থক হয়, তাহার জীবন যেন সুন্দর হয়।

সালাহুদ্দীন

মুর্শীদাবাদে গিয়া মুহ্‌সিন এক নূতন পরিবেষ্টনের মধ্যে পড়িলেন। ভগিনী মন্নুজানের স্নেহচ্ছায়ার বাহিরে গিয়া তিনি যেন কেমন অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। মুহ্‌সিনের এখন বয়স হইয়াছে, ওস্তাদ আগা শিরাজী, ওস্তাদ ভোলানাথ ও অন্যান্য শিক্ষকগণের নিকটে বিদ্যা, সঙ্গীত, নানারূপ ব্যায়াম এবং আরো কত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করিয়া তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন; কিন্তু তবু কেন গৃহের প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য, সর্বোপরি স্নেহময়ী ভগিনীর জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই কেমন কেমন করে?

দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল; নূতন জায়গায় ধীরে ধীরে মুহ্‌সিনের মন বসিতে লাগিল। মুর্শীদাবাদের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসায় প্রবেশ করিয়া তিনি অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্নুজান বুদ্ধিমতী, মুহ্‌সিনের বুদ্ধিও প্রখর। ভাই-ভগিনীর পরস্পরের সাহচর্যে তাহাদের ধীশক্তি যেন আরো তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আগা শিরাজীও তাহার জন্য অল্প পরিশ্রম করেন নাই। যত কিছু বিদ্যা-সম্পদ, গুণ-গরিমা তাঁহার মধ্যে লুকাইয়াছিল সমস্তই তিনি তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র-ছাত্রীকে দান করিয়াছিলেন। মুহ্‌সিন মুর্শীদাবাদে আসিয়া তাঁহার অন্তরের স্নেহ-তৃষা সহিয়াও পাঠ্য বিষয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেন। আরবী ফারসী সাহিত্যের উচ্চতম শাখায়, ধর্মশাস্ত্রের জটিলতম তত্ত্ব-আলোচনায় মুহ্‌সিনের যে-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতে তাঁহার ওস্তাদেরা বিস্মিত হইলেন। অসাধারণ এই ছাত্র। দেহ-চর্চায়, সঙ্গীত-চর্চায়, জ্ঞান-চর্চায়, তাহার জোড়া তখন মুর্শীদাবাদে মেলাই ভার। বলিষ্ঠ তাঁহার দেহ, মধুর তাঁহার কন্ঠ, সুপটু তাঁহার হস্ত, ধীশক্তি

ও জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত তাঁহার চিত্ত। এমন বিদ্যার্থীর প্রশংসা কোন্ শিক্ষক না করিয়া থাকিতে পারেন?

মুহম্মদ মুহ্‌সিনের প্রশংসায় মুর্শীদাবাদ ভরিয়া গেল। নবাব তাঁহাকে ডাকাইয়া একটি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন কিন্তু মুহ্‌সিনের জনক-জননী ইতিমধ্যে ইহ-সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, গৃহে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার স্নেহময়ী মাতৃ-স্বরূপিনী ভগিনী মন্নুজান আজ সংসারে একাকিনী। তাঁহার দাস-দাসী আছে, বিষয়-সম্পত্তি আছে, রূপ-যৌবন আছে, কিন্তু সত্যই আপনার বলিতে তাঁহার কাছে আজ আর কেহই নাই। ভাই মুহসিনের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে; তিনি তাঁহাকে গৃহে ফিরিবার জন্য আহবান করিয়াছেন। ভগিনীর এই আহবানের কাছে নবাব-দরবারের উচ্চ পদের মূল্য মুহসিনের চোখে এক কাণাকড়িও নয়। জগতে এখন তাঁহার একমাত্র বন্ধন ভগিনী মন্নুজান। তাঁহাকে ছাড়িয়া নবাবের সেবা—তাহাতে সম্মান যতই থাক, অর্থলাভ যতই হোক,—কখনই নয়, কখনই নয়। মুহ্‌সিন সসম্মানে সবিনয়ে নবাবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া হুগলীতে ফিরিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; নবাবও তাঁহার ভগিনীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তির পরিচয় পাইয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে গৃহে ফিরিবার আদেশ দিলেন। কয়েক বৎসর পরে ভাই-ভগিনীতে আবার মিলন ঘটিল। মন্নুজান চোখের জলে ভাইয়ের চোখে মুখে হাত বুলাইয়া আপনার কাছে টানিয়া লইলেন; মুহ্‌সিন সজল নেত্রে ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মন্নুজান খানমের মুখের দিকে চাহিয়া মুহম্মদ মুহ্‌সিন কি দেখিলেন? দেখিলেন: অনন্ত স্নেহ-করুণায় তাঁহার ভগিনীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, চোখের জল মুক্তার মতো সেখানে গড়াইয়া পড়িতেছে। আরো দেখিলেন: ভাইয়ের সহিত মিলনানন্দের পশ্চাতে মন্নুজানের চোখে মুখে উদ্বেলিত যৌবনের অসীম রূপ-লাবণ্যের প্রভা জ্বলিয়া উঠিয়াও যেন কিসের আশঙ্কায় থাকিয়া থাকিয়া নিবিয়া যাইতেছে। দৃষ্টিমান ভ্রাতার চিত্ত ভগিনীর অজ্ঞাতসারে চঞ্চল হইয়া উঠিল. অজানা আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয়

দুরু দুরু কম্পিত হইল। কিসের জন্য মন্নুজানের মুখে এই ভীতি-কাতরতা? কিসের জন্য তাঁহার চিত্তে এই উদ্বেগ, এই ব্যাকুলতা? মন্নুজান খানম পরমা সুন্দরী যুবতী, অগাধ অর্থ-সম্পত্তি তাঁহার করতলগত, বুদ্ধি-বিদ্যায় তিনি যে-কোনো পুরুষের সমকক্ষ। তবে তাঁহার কিসের আশঙ্কা?

মুহ্‌সিন অত্যন্ত সাবধানতার সহিত চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন: তাঁহার জনক-জননীর তিরোধানে বহু জনের লোভ-ক্রূর দৃষ্টি মন্নুজানের বিচ্ছুরিত রূপ যৌবন ও বিপুল অর্থ-সম্পত্তির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। মুহ্‌সিনের সতর্ক দৃষ্টি চারিদিকে ফিরিতে লাগিল। কেহ নানাভাবে ভয় দেখাইতে লাগিল, কেহ নানারূপ সুখ-সুবিধার কথা বলিয়া লোভের ফাঁদ পাতিল, কেহ বা ব্যর্থকাম হইয়া বিষ-প্রয়োগে মন্নুজানের প্রাণ লইবার চেষ্টা করিল। স্নেহময় ভ্রাতা সমস্ত ভীতি-প্রলোভন, সব-কিছু আপদ-বিপদ হইতে ভগিনীকে সদাজাগ্রত সতর্ক প্রহরীর মতো রক্ষা করিতে লাগিলেন। মন্নুজান বুঝিতে পারিলেন: মুহসিন কুচক্রীদের চক্রজাল ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, সমস্ত বাধা-বিপত্তি, আশঙ্কা-ভীতি, প্রলোভন-মায়া তুচ্ছ করিয়া ভগিনীর জীবন, সম্পত্তি ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। মুহ্‌সিনের এইরূপ আনুগত্য দেখিয়া মন্নুজানের অন্তর একেবারে গলিয়া গেল, ভাইকে তিনি দ্বিগুণতর স্নেহে জড়াইয়া ধরিলেন।

এই সময় একটি লোকের উপর মুহম্মদ মুহ্‌সিনের নজর পড়িয়া গেল। তাঁহার নাম মির্জা সালাহুদ্দীন, আগা মোতাহারের ভ্রাতুষ্পুত্র—নবাবের নিযুক্ত হুগলীর ফৌজদার। সালাহুদ্দীনেরও আদিম বাসস্থান ইস্পাহানে। তিনি নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলে অতি অল্প বয়সে বাংলায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। সালাহুদ্দীন ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া তিনি সুকবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও রাজনৈতিক জ্ঞান অসাধারণ ছিল। নবাব আলীবর্দী খাঁ সালাহুদ্দীনের বুদ্ধি-কৌশল ও পাণ্ডিত্যের কথা

জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আপনার দরবারে ডাকাইয়া লন। তখন এদেশে বর্গীর ভীষণ উপদ্রব। তাহাদের সহিত সুবিধাজনক শর্তে সন্ধি করা এক মহাসমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আলীবর্দী খাঁ সুচতুর সালাহুদ্দীনকে এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। সালাহুদ্দীনও অপূর্ব কৌশল ও চতুরতার সহিত বর্গী সরদারের সহিত সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করিয়া নবাবের প্রশংসাভাজন হইলেন। এই ঘটনার পর নবাব দিল্লীতে সম্রাটের নিকট সালাহ্‌দ্দীনের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। সম্রাটও সালাহ্‌দ্দীনকে উচ্চ উপাধি, বিস্তৃত জায়গীর ও মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে হুগলীর ফৌজদার-পদ প্রদান করিয়া যোগ্যতার সম্মান করিলেন।

এই রূপবান গুনবান সম্ভ্রান্ত উচ্চাপদস্থ মির্জা সালাহুদ্দীনের দিকে মুহম্মদ মুহ্‌সিনের নজর পড়িল। মন্নুজানের রূপ-যৌবন, বিষয়-সম্পত্তি যেন তাঁহার কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেরই স্বার্থবিষাক্ত দৃষ্টি তাঁহার উপর। যদি সালাহ্‌দ্দীনের সাথে মন্নুজানের বিবাহ দেওয়া যায়, সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। যোগ্য পাত্রে যোগ্যা পাত্রী অর্পিত হইবে। সালাহ্‌দ্দীনের পদমর্যাদা ও বুদ্ধিমত্তাকে জানিয়া কাহারও কোন দুরভিসন্ধি মাথা তুলিতে পারিবে না। আগা মোতাহার মৃত্যুশয্যায় ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহ্‌দ্দীনকে কন্যা মন্নুজানের পানিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সালাহ্‌দ্দীন তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু রাজনৈতিক ও বৈষয়িক নানারূপ ঘটনা-পরম্পরার ভিতর দিয়া তিনি যেভাবে ভাসিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে এতদিন সেকথা স্মরণ করিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। মুহ্‌সিনের প্রস্তাবে আগা মোতাহারের অনুরোধ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। মন্নুজানও ভ্রাতার ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিলেন না। শুভদিনের শুভক্ষণে, বিদ্বান, কবি, রাজনীতিক সালাহ্‌দ্দীনের সহিত বিদুষী, বুদ্ধিমতী, সঙ্গীত-শিল্পী, অন্য বহু সদ্‌গুণে বিভূষিতা মন্নুজানের বিবাহ হইয়া গেল। মুহম্মদ মুহ্‌সিন প্রিয়তমা ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভগিনীপতির হস্তে দিতে পারিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

মন্নুজান ও সালাহ্উদ্দীন

মন্নুজান খানম স্বামী মির্জা সালাহ্উদ্দীনকে পাইলেন; কিন্তু যাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার মুহূর্তমাত্র সময় কাটিত না, যাঁহাকে সম্মুখে না দেখিলে তিনি দুই চক্ষে অন্ধকার দেখিতেন, সেই প্রাণপ্রিয় ভ্রাতাকে অনেকটা হারাইয়া বসিলেন। স্বামী-সাহচর্য তাঁহার ভ্রাতাকে বেশ খানিক দূরে সরাইয়া দিল। নববিবাহিতা যুবতীর অন্তরে ইহা প্রথমে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিল; কিন্তু দাম্পত্য-প্রেমের মধুসিঞ্চনে সে ক্ষত শুকাইতে বিলম্ব হইল না। তিনি যে মুহসিনকে আগের চেয়ে কম ভালোবাসিতে লাগিলেন, স্নেহের ভাইটি তাঁহার যে আগের মতো আর স্নেহের পাত্র রহিল না, তাহা নয়। তবু যেন সালাহ্উদ্দীনের সঙ্গ মন্নুজান খানমের কাছে মধুরতর বোধ হইল। মুহসিনের প্রতি স্নেহ একটুও কমিল না, তথাপি তাঁহার প্রয়োজনবোধ আপাততঃ যথেষ্ট কমিয়া গেল।

মুহম্মদ মুহ্‌সিন ভগিনীর প্রতি গভীর স্নেহ পোষণ করিলেও ইহাই চাহিতেছিলেন। তিনি এখন পূর্ণ যুবক; কত শত আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙিন খেয়ালে তাঁহার চিত্ত ভরপুর। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্নেহাঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া তাঁহার প্রাণ আর সান্ত্বনা মানে না। উদার শিক্ষায় তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, দেশ-বিদেশের কেচ্ছা-কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার তরুণ মন উড়ু উড়ু হইয়াছে। কবে কোথায় কোন্ পথে তিনি চলিবেন, তাহার ঠিকানা কি? কিন্তু একাকী নিঃসঙ্গ মন্নুজান—তাঁহার প্রাণপ্রিয় স্নেহময়ী ভগিনী তাঁহাকে বিনাসূতায় বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সালাহ্উদ্দীন যখন আসিলেন, মন্নুজানের দেহমন অধিকার করিয়া বসিলেন, তখন মুহ্‌সিন অনেকখানি ছাড়া পাইলেন, তিনি স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো এখন তিনি বিচিত্র জগতের প্রতি চক্ষু ভরিয়া চাহিতে পারিবেন, তাঁহার পথ আগুলিয়া আর কেহ দাঁড়াইবে না। পিতা ফয়জুল্লা প্রচুর অর্থ-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, মাতা জয়নাব খানমও বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া ইহসংসার হইতে বিদায় নিয়াছেন। মুহসিন এসমস্তের উত্তরাধিকারী। কিন্তু মন্নুজান খানমের স্বামী—পরম বুদ্ধিমান, সাধুচরিত্র সালাহুদ্দীন তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন। মন্নুজানের অগাধ সম্পত্তি এবং তাঁহার নিজের বিরাট জায়গীর তিনি অবশ্যই দেখাশুনা করিবেন; তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুহ্‌সিনের সম্পত্তিরও তত্ত্বাবধান করিবেন। এই আশা-ভরসায় মুহ্‌সিন বিষয় বৈভবের দিকে মন না দিয়া অন্য চিন্তায় মশগুল হইয়া গেলেন। এই সময়ের ঘটনা-পরম্পরা মুহ্‌সিনের মনে যে-প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া তুলিল তাহাতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্ধারিত হইয়া গেল।

মন্নুজান রূপবতী, বুদ্ধিমতী; সালাহুদ্দীন রূপবান, বিদ্বান, কূট রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন। দু'জনে মিলিয়া তাঁহারা বিষয়-সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কি-ভাবে সম্পত্তির উন্নতি হইতে পারে, প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িতে পারে, কি কি কাজ করিলে হুগলীবাসীদের কল্যাণ হইতে পারে, স্বামী-স্ত্রীতে এ সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা চলিতে লাগিল। দু'জনে মিলিয়া যাহা স্থির করিতেন সালাহুদ্দীন তাহাই কার্যে পরিণত করিতেন। এইভাবে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আগা মোতাহার ইমামবাড়ার নির্মাণ-কার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা সেটিকে আরো বড় করিয়া তৈরি করিলেন এবং চারিদিককার লোকের সুবিধার জন্য সেখানে একটি হাট বসাইলেন। এইরূপ আরো কত শত ছোট বড় কাজ তাঁহারা করিলেন।

কিন্তু দাম্পত্য-জীবনে চিরদিন সুখের স্রোত বহিয়া যায় না। মন্নুজান খানম ও সালাহুদ্দীনের মধ্যেও সময় সময় মতভেদ দেখা দিত এবং সালাহুদ্দীন নিজের কর্তৃত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য

নিজের ইচ্ছাকেই বলবৎ করিবার চেষ্টা করিতেন। ইমামবাড়ার ব্যয়নির্বাহে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় এই উদ্দেশ্যে আগা মোতাহার পরগনে সোবনল নামক একটি জমিদারী কিনিয়াছিলেন। ইহার পরিচালনা লইয়া মাঝে মাঝে মন্নুজানের সহিত সালাহুদ্দীনের কলহ হইতে লাগিল।

সালাহুদ্দীন এখন আর ফৌজদার-পদে প্রতিষ্ঠিত নন; জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতেই তাঁহার সমস্ত সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু ফৌজদারের পদ ত্যাগ করায় তিনি নবাবের অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্মকুশল বিশ্বস্ত কর্মচারীকে নবাব ছাড়িতে চান নাই; কিন্তু তিনি দাম্পত্য জীবনের শান্তিময় আনন্দকেই অধিক কামনা করিলেন। শেষে নবাব তাঁহাকে ছাড়িলেন, কিন্তু তাঁহার উপর খুশি থাকিলেন না। এই অবস্থায় পরগনে সোবনলের পরিচালনাকার্যে পতি-পত্নীর মতভেদের জন্য ক্রমেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। নবাব সুযোগ বুঝিয়া ঐ জমিদারী সরকারে বাজেয়াফ্ত করিয়া লইলেন।

সালাহুদ্দীন খুব জব্দ হইলেন। মন্নুজান খানম পিতার ক্রীত সম্পত্তি নষ্ট হইল দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, সালাহুদ্দীনের সহিত বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করিলেন। কি ভাবে নষ্ট সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হইতে পারে, তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবার তিনি সালাহুদ্দীনের কর্তৃত্ব সহ্য করিবেন না, ইহাই স্থির করিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর এই ব্যবহারে সালাহুদ্দীন মর্মে মরিয়া গেলেন। তিনি জমিদারীর কার্য করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মন তাঁহার অন্য স্থানে গিয়া আশ্রয় খুঁজিল। নিজের দুর্বুদ্ধিতে সম্পত্তি নষ্ট হইল এবং পত্নীর মনও এমন ভাবে তিক্ত হইয়া গেল, এই দুইটি বেদনার হাত হইতে বাঁচিবার আশায় তিনি কাব্য-চর্চায় মন দিলেন। ভাবিলেন: ইহাতেই হয়তো মনে কিছু শান্তি আসিতে পারে। কবিতা তিনি অনেক লিখিয়া ফেলিলেন। অধিকাংশই প্রেমের কবিতা, মন্নুজানকে উদ্দেশ করিয়াই যেন সেগুলি রচিত।

বিদুষী মন্নুজান স্বামীর রচিত কবিতা পাঠ করিয়া মনে

মনে হাসিলেন। ভাবিলেন : এইবার পুরুষালী অহংকার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন : কেন, নবাবের সুরুপূর্ণ ফৌজদারের ভাব-পরিবর্তনের কারণ কি? তিনি পুরুষ, আমি নারী, তিনি অসামান্য রাজনীতিকুশল, আমি জ্ঞানহীনা, তিনি সুদক্ষ বিষয়ী ব্যক্তি, আমি বিষয় ব্যাপারে অনভিজ্ঞ; তাঁহার মত নিতুর্ল, আমার মত ভুলাহীন, এই যদি সত্য, তবে আবার তাঁহার কবিতা-রচনা কিসের জন্য? সালাহদ্দীন জবাব দিলেন :

সখি, তুমি যে নয়ন-বাণ হানিয়াছ
তাহা আমার মর্মে গিয়া বিঁধিয়াছে।

তোমার দুইটি বাঁকা ভুরু দুইখানি তলোয়ার
তার ঘায়ে চিত্ত আমার জর্জরিত।

আমাতে কি আর আমি আছি?
আমি যে, সে তো তোমারই চরণে লুণ্ঠিত।

পতি-পত্নীতে আবার মিলন হইল। মন্নুজান এখন আর সালাহদ্দীনের উপেক্ষার বস্তু নয়। কিন্তু মন্নুজানের অদৃষ্টে মেঘ সঞ্চার হইতেছিল। স্বামী পত্নীর সম্পত্তি নষ্ট করিয়া মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। মন্নুজান হয়তো সে অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রেমিক স্বামী নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িল। দুশ্চিন্তা শুধু তাঁহার পত্নীর সম্পত্তিনাশের জন্য নয়। নবাবের অনুগ্রহ হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন, ইহাও তাঁহার মনে পরম ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল। এছাড়া ইংরেজদের সহিত তাঁহার বিরূ প্রভু নবাবের মনোমালিন্য হইতেছিল, এজন্যও তিনি মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। মন্নুজান স্বামীর শরীর ভাঙিতে দেখিয়া ভয় পাইলেন; কত রকমে তাঁহার সেবা-যত্ন করিয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পুণ্যতীর্থ কারবালা ও মক্কায় বহু ধন-রত্ন পাঠাইবার পর অল্পবয়সেই সালাহদ্দীন মৃত্যুর পরপারে চলিয়া গেলেন।

পতিগতপ্রাণা সতী পতীর শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা আর তাঁহার কাছে নাই, স্বামী ছিলেন, তিনিও

মারা গেলেন। কিন্তু দুঃসহ শোকের মধ্যেও তাঁহাকে চোখ মেলিয়া চাহিতে হইল, দৃঢ় পায়ে দাঁড়াইতে হইল। তিনি ছাড়া আপাততঃ তাঁহার বিপুল সম্পত্তি রক্ষা করিবার আর কেহ নাই। এই বিপদ-মুহূর্তে মন্নুজানের বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা, অসাধারণ বৈষয়িক জ্ঞান খুবই কাজে আসিল। তিনি নিজেই সমস্ত জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। স্বামীর ত্রুটিতে পরগণা সোবনল নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। মন্নুজান দক্ষতাগুণে আবার তাহা ফিরিয়া পাইলেন। এইবার প্রজার হিত-কামনায় তিনি মন-প্রাণ ঢালিয়া দিলেন; কূপ খনন, পুষ্করিণী খনন, মসজিদ সংস্কার প্রভৃতি বহু সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্মকুশলতা ও লোকহিতৈষণা দেখিয়া সকলে বিস্ময় মানিল, কৃতজ্ঞতায় মানুষের শির অবনত হইল।

মুহ্‌সিনের চিত্ত-বিপ্লব

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের স্মরণীয় দিনটি তখনো আসিতে বিলম্ব আছে; কিন্তু ছোট বড় দুই একটি ঘটনায় তাহার এক-আধটু ছায়াপাত হইতে শুরু করিয়াছে। এমনি সময়ে একদিন মন্নুজানের স্বামী সালাহুদ্দীন প্রিয়তম পত্নীকে ছাড়িয়া জীবন-নদীর ওপারে চলিয়া গেলেন (১৭৫৪)। মুহ্‌সিন তখন আপনার ভাবে আপনি মশ্‌গুল। মন্নুজানের বিবাহের পর সংসারের বন্ধন তাঁহার অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল; তিনি উদাস পথিকের মতো সংসারের এপথে ওপথে ঘুরিতেছিলেন। ইংরাজ এদেশে আসিয়া কিরূপে ধীরে ধীরে নিজেদের শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, মুহসিনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে হঠাৎ একদিন তাহা পরিষ্কার হইয়া উঠিল; তিনি এক অজানা আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন। মুহ্‌সিন গভীরভাবে ঘটনার গতি-ভঙ্গিমা, প্রধান প্রধান পুরুষের গতিবিধি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ইংরাজ বণিকের ভাষা না শিখিলে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার তেমন সুবিধা হয় না, তাই মুহ্‌সিন ইংরাজী শিখিলেন, হয়তো খুব ভালোভাবে নয়, কিন্তু কাজ চলিতে পারে অন্ততঃ এতটুকু শিখিলেন। দাড়ি-গোঁফ কামানোর অভ্যাস করিয়া ইংরেজের পোষাক ধরিলেন। মুসলমানী পোষাক অবশ্য তিনি ছাড়িলেন না; কিন্তু মাঝে মাঝে ইংরাজী পোষাক পরিয়া তিনি বেড়াইতে লাগিলেন। মুহ্‌সিনের দৃঢ়গঠিত ব্যায়ামপটু বলিষ্ঠ দেহ, অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা, সর্বোপরি তাঁহার তীব্র চোখের চাহনি তাঁহাকে শীঘ্রই ইংরাজ ও নবাব সরকার দুই মহলেই শুধু পরিচিত নয়, প্রিয় করিয়া তুলিল। তিনি চারিদিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। সর্বনাশের সুনিশ্চিত সুস্পষ্ট লক্ষণ তিনি কিছু দেখিতে পাইলেন

না। তবু কেন থাকিয়া থাকিয়া অজানা আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ দুরু দুরু কাঁপিয়া ওঠে, মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির পতন-সম্ভাবনার দুঃস্বপ্ন আসিয়া তাঁহার চিত্তকে বিষণ্ণ ক্লিষ্ট করিয়া তোলে।

মুহ্‌সিন প্রাণমনে খোদাকে ডাকিলেন ঃ "হে খোদা, দয়াময়, মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির তুমি রক্ষক, মুসলমানের মান-সম্ভ্রমের হেফাজত তোমারই হাতে ন্যস্ত, তুমি কি আমার আশঙ্কা সত্যে পরিণত করিবে? না, না, তাহা করিও না প্রভু! আমার বিপুল বিষয়-সম্পত্তি বরং ধ্বংসের মুখে পতিত হোক, আমার প্রিয়তমা ভগিনীর সুখৈশ্বর্যময় জীবন বরং ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাক, আমার যৌবনের সমস্ত আশা-স্বপ্ন, শক্তি-সম্পদপুষ্ট এই দেহ ধূলায় লুন্ঠিত হোক! শুধু আমার কেন, সহস্র সহস্র বাঙালী বীরের রক্তে ধরাতল রঞ্জিত হোক, তবু নবাবের রাজ-শক্তিকে তুমি ধূলায় লুন্ঠিত করিও না প্রভু!"

মুহ্‌সিনের মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ তখনই তিনি ভগিনীপতি সালাহুদ্দীনের মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন। ইহাও শুনিলেন যে, তাঁহার অভাবে মন্নুজান স্বয়ং বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছেন। ভগিনীর জন্য মুহ্‌সিনের ভ্রাতৃচিত্ত কাঁদিয়া উঠিল; তাঁহার একবার ইচ্ছা হইল : এইসব খেয়াল ছাড়িয়া ভগিনীর পাশে গিয়া দাঁড়ান। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। মন্নুজান বিদুষী, বুদ্ধিমতী; অসাধারণ তাঁহার প্রতিভা, অদ্ভুত তাঁহার কর্মশক্তি। তিনি নিশ্চয়ই দক্ষতার সহিত জমিদারী পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন। আর তাহা যদি তিনি না-ও পারেন, তথাপি মুহ্‌সিন এখন হুগলীতে ফিরিতে পারিবেন না। প্রিয়তমা ভগিনী, অর্থ-সম্পত্তি, দেহ-প্রাণ সবই এখন তাঁহার কর্তব্যের সম্মুখে তুচ্ছ। বাংলার রাজশক্তির সেবায় তিনি দরবেশ সাজিয়াছেন; অন্য কোন সাধন সংকল্প তাঁহার সম্মুখে আজ নাই।

এইভাবে এক বৎসর কাটিল, দুই বৎসর কাটিল, পলাশীর যুদ্ধের দিন ঘনাইয়া আসিল। বিপদ-মুহূর্তে তাঁহার মন অবসন্ন-প্রায় হইয়া পড়িল। তিনি আসন্ন দুর্ভাগ্যের কল্পনায় কম্পিত

হইলেন। কর্মযোগী মুহসিনের আজ এ ভাব কেন হইল? কেন তিনি নিজের বলিষ্ঠ বাহু লইয়া নবাবের সম্ভ্রম রক্ষার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন না? কে জানে তিনি হইলেন কিনা? কে বলিতে পারে বিপক্ষের আঘাত তিনি বুক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন কিনা?

পলাশীর যুদ্ধের দিন কাটিয়া গেল। বাঙ্গালীর রাজ্য গেল; মুসলিমের মান গেল। তাঁহার জীবনে প্রয়োজন কি? মুহসিন অবশেষে সাধু-সজ্জনের সঙ্গ লইলেন; বিবাহ-সংকল্প ত্যাগ করিলেন; জীবনের সকল সুখ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলেন। দাড়ি-গোঁফ তিনি ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আর রাখিলেন না; দরবেশের পোশাক তিনি পরিয়াছিলেন, তাহা আর ছাড়িলেন না। সাধুসঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

এক বৎসর দুই বৎসর করিতে করিতে পলাশী যুদ্ধের পর পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গেল। মুহসিনের সংসার-বিতৃষ্ণা ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। প্রিয়তমা ভগিনী মন্নুজানের কথা তাঁহার মনে পড়িত না, এমন নয়। তাঁহারই অঞ্চলের স্নেহচ্ছায়ে, তাঁহারই প্রাণের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসায় তিনি মানুষ হইয়াছেন, তিনি আজ একাকিনী সংসারের কর্তৃত্ব করিতেছেন। তাঁহার কথা মুহসিনের মনে পড়িবে না কেন? কিন্তু সন্ন্যাসী দরবেশ মুহসিন মন্নুজান খানমের ভ্রাতা মুহসিনকে সহজেই পরাজিত করিল। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পুণ্যভূমির স্পর্শ পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন।

মুহসিনের দেশভ্রমণ

মুহসিন শৈশব হইতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত হইলেও নিতান্ত ননীর পুতুলটি ছিলেন না। ব্যায়ামপুষ্ট সুগঠিত দেহ, বিদ্যা জ্ঞান ও সাধনার পরিপুষ্ট মন, সাধু সঙ্গের ফলে দৃঢ়ীভূত চরিত্র এসমস্তই তাহার ছিল। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে তিনি যে উন্মাদনার মধ্যে কাল কাটাইয়াছেন, এবং তাহার শোচনীয় পরিণতির পর যে—নিভৃত সাধনায় নিজেকে সমাহিত করিয়াছেন, তাহাতে জীবনের দুইটি দিকের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে। সুতরাং মুহসিনের বিদেশ-যাত্রায় আশঙ্কা কি? গুরু আগা শিরাজীর মুখে বাল্যে তিনি ভ্রমণকাহিনী শুনিয়াছেন, কই তেমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার তো সে নয়। পথে বিপদ আছে, কষ্ট আছে। কিন্তু আনন্দ আছে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী। খোদার মহিমা যাহারা উপলব্ধি করিতে চায়, খোদার সৃষ্টির অন্ততঃ খানিকটা না দেখিলে তাহাদের আশা পূর্ণ হইবার নয়। অনন্ত প্রসারিত জলরাশি, অভ্রভেদী উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, ঘন সন্নিবিষ্ট গহন অরণ্য, সীমাহীন শ্যামল প্রান্তর, প্রাণহীন নিঃসীম বালুকা-রাশি—এইরূপ অসংখ্য বস্তু জগতে দেখিবার আছে। অগণিত বরেণ্য নরনারীকে আমাদের জানিবার আছে। সংখ্যাহীন জ্ঞান-সাধকের কাছে সৃষ্টির গূঢ় তত্ত্ব আমাদের বুঝিবার আছে; খোদার সম্বন্ধে কতো দুর্জ্ঞেয় রহস্য আমাদের শিখিবার আছে। এই সবের সন্ধানে দেশে ঘুরিয়া বেড়ানো কি কম আনন্দের? মুহসিনের চিত্ত কোন বাধা মানিল না। তিনি মক্কা-মদিনা জিয়ারত করিবেন, নজফ-কারবালা দর্শন করিবেন, ঐসব দেশের মাটিতে যে পুণ্যস্মৃতি জড়াইয়া আছে, তাহার সৌরভে মনপ্রাণ স্নিগ্ধ শীতল করিবেন। এদেশে তো তাঁহার থাকা চলে না! পলাশীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও ভাগ্য চিরদিনের জন্য নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

চিরকুমার সন্ন্যাসীর জীবন তাঁহার ; তিনি তীর্থ-ভ্রমণে অন্তরের সকল জ্বালা জুড়াইবেন। তাই মুহসিন কোন বাধা মানিলেন না ; প্রাণের অসীম আবেগে ছুটিয়া চলিলেন। বত্রিশ বৎসর তাঁহার বয়স ; তাঁহার হাড়ি এখন আর নিতান্ত কাঁচা নয়। তিনি সাহসে ভর করিয়া উদাসী মনের খোরাক জোগাড় করিতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তখনকার দিনের দেশভ্রমণ কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল, এযুগে তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারা একটু কঠিন। মটর নাই, রেল নাই, অন্যরূপ যানবাহন পাওয়াও সহজসাধ্য নয়। তাহা ছাড়া পথ তখন অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ; কোথায় কোন্ চোর-দস্যুর হাতে পড়িতে হয়, কোন্ হিংস্র পশুর উদ্যত গ্রাস পথিকের জীবন বিপন্ন করে তাহারও বিন্দুমাত্র স্থিরতা নাই। বিশ্রামের স্থান—সরাই-খানা সকল জায়গায় মিলে না ; অনেক পথ চলিবার পর হয় তো কোথাও একটা আড্ডা মিলিয়া গেল, নয়তো গাছের তলায় কিম্বা গাছের উপরে রাত কাটাইতে হইল। তখনকার দিনের ভ্রমণ-কারীকে এই সমস্ত বিপদ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া পথে বাহির হইতে হইত। মুহসিন তাহাই করিলেন। চিত্তে তাহার জ্ঞানের জ্যোতিঃ, বুকে তাঁহার পুণ্যের আশা, মুখে তাঁহার আল্লার নাম, দেহে তাঁহার বিপুল শক্তি-সহিষ্ণুতা। তিনি দুর্ভাগা স্বদেশকে ছাড়িয়া শান্তির আশায় পুণ্য তীর্থে চলিলেন।

প্রথমে চলিলেন তিনি আরবের দিকে। হজরত মোহাম্মদ (সঃ) যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, যে দেশের মাটি তাঁহার চরণের স্পর্শ পাইয়াছে, যে-দেশের জল হাওয়া তাঁহারই সুরভি স্মৃতি জড়াইয়া আছে। যে-দেশের মাটিতে তাঁহার পুণ্য দেহ মিশিয়া রহিয়াছে, সেখানেই মুহসিনের চিত্ত ছুটিয়া যাইতে চাহিল। তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া আপনার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মোগল রাজশক্তি তখনো একেবারে নিঃশেষ হয় নাই ; তাঁহাদের কৃতিত্বের শত সহস্র চিহ্ন তখনো দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে উজ্জ্বল হইয়া আছে। মুহসিন

সেগুলি দেখিতে লাগিলেন, আর হৃদয় তাঁহার বেদনার ঘায়ে জর্জরিত হইতে লাগিল,—মোঘলের শক্তিমূল তখন ছিন্ন হইয়াছে, তাহার পতন অত্যন্ত আসন্ন। কিন্তু তিনি সকল সহিয়া শান্তি-নিকেতনের দিকে ছুটিলেন। প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখিয়া তিনি বিস্মিত মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু গতি তাঁহার বন্ধ হইল না। তিনি সম্মুখেই চলিতে লাগিলেন। কতো নদনদী, গিরিকান্তার তিনি ছাড়িয়া চলিলেন; কতো নগর-নগরী, বিস্তীর্ণ জনপদ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে তিনি তার চিরপ্রিয় আরবদেশে পেঁাছিলেন, সেখানকার মাটি তুলিয়া চোখে-মুখে মাখিলেন। ক'াবার পার্শ্বে বসিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ইব্রাহিম নবীর কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ছিলেন দলের সর্দার, গোষ্ঠীর রাজা। তাঁহার পুত্র ইসমাইল এইখানে আল্লার নামে কোরবান হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আজ কোথায়? মুসা, দাউদ, সোলায়মান—কোথায় গেলেন ইহারা? হজরত মোহাম্মদ (সঃ), তাঁহার অমিত-প্রতাপ খলিফাগণ, তাঁহারাই বা আজ কোথায়? মুসলিম জগতে যে শক্তি, যে মহিমা অর্জন করিয়াছিল, তাহাই বা আজ কি করিয়া এতো হীন হইয়া পড়িল? মাতৃভূমি বাংলায় আজ বিদেশীর অধিকার, ভারতে আজ মোঘল-শক্তির পতন। মুহসিনের চক্ষু ভরিয়া অশ্রুর বান ডাকিল; সংসারের অনিত্যতার কথা ভাবিয়া তিনি প্রভুর চরণে শরণ মাগিলেন।

মক্কা হইতে হজ্ সম্পন্ন করিয়া মুহসিন মদিনায় চলিলেন। হজরতের রওজা-মোবারকে পড়িয়া তিনি আবার কাঁদিলেন। মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) প্রচারিত বাণীর বাহক মুসলিম আজ আল্লার কোপানলে ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছে! এয়্ হজরত আজ যদি তুমি বাঁচিয়া থাকিতে। মুহসিনের আত্মা যেন সাড়া দিয়া উঠিল। আজ যদি পয়গম্বরে-খোদা ফিরিয়া আসিতেন, মুসলিমের কখনো এই দুর্দশা হইত না, এমন হীন জীবন তাহাকে যাপন করিতে হইত না। সে আবার গৌরবের আসনে বসিতে পারিত, তাহার শির আবার মহিমায় সমুন্নত হইত, তাহার সম্ভ্রম আবার সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। সত্যই যদি আজ

মোহাম্মদ মোস্তফা পুনর্বার বাঁচিয়া উঠিতেন। মুহসিন লোকান্তরিত মহাপুরুষকে যেন ডাকিয়া বলিলেন ঃ এয়, হজরত আজ যদি তুমি আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে! প্রার্থনার মধ্যে মুহসিন আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। যেন স্বপ্নাবেশে দেখিলেন ; হজরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন ঃ বৎস মুহসিন, মুসলমান আপনার দুর্ভাগ্য আপনিই ডাকিয়া আনিয়াছে। এজন্য তুমি বৃথা আক্ষেপ করিয়া কি করিবে? তুমি বরং আপনাকে প্রস্তুত কর, তোমার দ্বারা একটি মহৎ কার্য সাধিত হইবে। মুহসিন জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন ; তাঁহার অন্তরে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। মুসলিমের দুর্ভাগ্যের বেদনা ঘনীভূত হইয়া তাঁহার চিত্তকে ঘিরিয়াছিল ; তাহা যেন আজ অনেকটা হালকা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মনে এক নূতন আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রভু বলিলেন ঃ তোমার দ্বারা দুনিয়ার একটি মহৎ কার্য সিদ্ধ হইবে! কী সে মহৎ কার্য? কী সে গুরু কর্তব্যভার যাহা তাঁহাকে বহন করিয়া জীবনের কয়েকটি দিন চলিতে হইবে? তাহার পর প্রস্তুত হইবার কথা। মুহসিন জ্ঞান, বিদ্যা, শক্তি সবই অর্জন করিয়াছেন, ব্যায়াম, সঙ্গীতচর্চা—কোনটাই তাঁহার করিতে বাকী নাই। আধ্যাত্মিক সাধনা—তাহারও আস্বাদ এই অল্প বয়সে কিছু পাইয়াছেন। তবে আবার তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে বলা হইল কেন? তিনি ভাবিলেন ঃ হয়তো তাঁহার জ্ঞান-সাধনা এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই প্রভু তাঁহাকে এরূপ আদেশ করিলেন। হাজী মুহসিন মদিনা হইতে নজফ শহরের দিকে চলিলেন। নজফ, কারবালা শিয়া সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি ; মক্কা-মদিনার তীর্থ-রেণু মাখিয়া তিনি প্রথমে নজফে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নজফের পথে মুহসিন সর্বস্বান্ত হইলেন। শ্রান্ত হইয়া একদিন তিনি পথিপার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময় এক চোর আসিয়া তাঁহার পুঁটলিটি লইয়া গেল। হাজী জাগিয়া দেখেন ঃ তাঁহার সমস্ত টাকা-কড়ি চুরি লইয়াছে। এখন কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি এক মসজিদে গিয়া আশ্রয় হইলেন। সেখানে দৈবক্রমে স্ববংশীয় নজফবাসী একটি

লোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। লোকটি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পরম আদর-যত্নে আপনার গৃহে রাখিলেন। নজফে অনেক শিয়া আলিম-উলামার বাস। মুহসিন একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া আপনার জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। তিনি মুহসিনের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন : তাঁহার ছাত্র অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁহাকে জ্ঞানদান করিবার জন্য তিনি তখনই সাগ্রহে সম্মতি জানাইলেন।

এইখানে একদিন এক মজার কাণ্ড ঘটিল। একদিন হাজী মুহম্মদ মুহসিন একটি বাগানে বসিয়া আরাম করিতেছেন। স্নিগ্ধ বাতাসে তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় একটি চোর প্রহরীর তাড়া খাইয়া সেই বাগানে আসিয়া ঢুকিল এবং হাজী মুহসিনকে নিদ্রিত দেখিয়া চোরাই মাল তাঁহার শিয়রে রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে চোরের খোঁজ করিতে করিতে প্রহরীরা বাগানে ঢুকিয়া দেখিল : একটি লোক ঘুমাইয়া আছে, তাহার সিঁথানে চোরাই মাল! ইহা দেখিয়া তাহারা মনে করিল ; চোর নিদ্রার ভাণ করিয়া তাহাদের হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কথা কি? তাহারা তখনই হাজীকে পাকড়াও করিয়া হাজতে লইয়া গেল। মুহসিন অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। তিনি যখন ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন, তখনো চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বিচারের জন্য তিনি কাজীর দরবারে নীত হইলে বিচারক অবাক বিস্ময়ে হাজীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মুহসিন তখন আনুপূর্বিক সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। কাজী হাসিতে হাসিতে তাঁহা কে মুক্তি দিলেন।

নজফ হইতে মুহসিন শিয়ার মাতম্‌গাহ্‌ কারবালায় গমন করিলেন। যে ফোরাত একদিন ইমাম হোসেন ও তাঁহার পরিবারবর্গের উষ্ণ রুধির-স্রোতে রঞ্জিত হইয়াছিল, যাহার তীরে ইমাম-পরিবারের দুগ্ধপোষ্য শিশুর বক্ষে বিপক্ষের বাণ আসিয়া বিদ্ধ হইয়াছিল, যাহার স্রোত একদিন সীমারের হস্তে

ইমাম হোসেনের শির দেহচ্যুত হইতে দেখিয়া কাতর ক্রন্দনে ছুটিয়া চলিয়াছিল, সেই ফোরাতের কূলে মুহসিন উপবেশন করিলেন। অতীত ইতিহাসের কতো স্মৃতি তাঁহার মনের মধ্যে আসিয়া ভিড় জমাইতে লাগিল। ইমাম হোসেনের শোচনীয় পরিণতির কথা স্মরণ করিয়া তিনি চোখের জলে বুক ভাসাইলেন। কাঁদিয়া খোদার দরবারে তাঁহার অন্তরের কতো না আকুল আবেদন জানাইলেন। তারপর প্রার্থনাপূত অন্তর লইয়া সেখান হইতে দেশান্তরে চলিলেন।

মিসরের জামে-আল-আজ্‌হার বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। মুহসিন এইবার সেই দেশের পথ ধরিলেন। কতো দিন গেল, মাস গেল, শেষে তিনি আল-কাহেরায় (Cairo) আসিয়া পৌঁছিলেন। জামে-আল্‌-আজ্‌হার তাঁহার মতো ছাত্র পাইয়া একেবারে লুফিয়া লইল। এখানে তিনি ধর্মাচার্যদের সঙ্গে থাকিয়া বহু নূতন জ্ঞানের অধিকারী হইলেন।

মিসরে কয়েক বৎসর কাটাইয়া তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষের প্রিয় জন্মভূমি ইরানের দিকে ফিরিলেন। পথের ক্লেশ তাঁহাকে দমাইতে পারিল না; মুহসিন যেন তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ। দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে তাঁহার দ্বিধা নাই, ক্লান্তি নাই, শঙ্কা নাই। ছোটো বড়ো কতো না বিপদ তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িতেছে, কতো না বেদনার আঘাতে তিনি জর্জরিত হইতেছেন, কিন্তু যোগী মহামানব নির্বিকার, অচঞ্চল। তাই সুদূর মিসর হইতে তিনি ইরানে আসিতে ভয় পাইলেন না। বহুদিন পথে কাটাইয়া তিনি পিতৃপুরুষের দেশে আসিলেন। ইস্পাহান তাঁহার দর্শনীয় স্থান। মন্নুজানের পিতা আগা মোতাহার এইখান হইতেই ভারতে গিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা হাজী ফয়জুল্লাও মাতুলের সন্ধানে এই শহর হইতেই ভারতের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণ ভরিয়া পিতৃপুরুষের জন্মভূমি দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অনেক দিন ইরানে কাটিয়া গেল।

অবশেষে নীড়পলাতক পাখি আবার নীড়ে ফিরিয়া আসিতে চাহিল। হাজী মুহম্মদ মুহসিনের মন স্বদেশের জন্য আবার কেমন

কেমন করিতে লাগিল। যৌবনে তিনি আশা-আকাঙ্খার একমুঠা ভস্ম সঙ্গে লইয়া খোদার দুনিয়া দেখিয়া প্রাণের অপরিসীম জ্বালা জুড়াইবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। আজ—এই বৃদ্ধ বয়সে—তাঁহার প্রাণে শান্তি আসিয়াছে কি? তবে তাঁহার মন আজ স্বদেশের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল কেন? মদিনায় প্রভুর আদেশ তাঁহার মনে পড়িল। কী সে মহৎ কার্য, যাহা সাধন করিবার গুরুভার তাঁকে বহন করিতে হইবে? তিনি নূতন সাধনার সন্ধানে স্বদেশের দিকে আসিতে লাগিলেন।

হাজী মুহম্মদ মুহসিন যখন লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। বিভিন্ন দেশ হইতে শাস্ত্রজ্ঞান ও হিক্‌মত কুড়াইয়া নিয়া বৃদ্ধ মুহসিন ভারতে মুসলিম জ্ঞান ও সভ্যতার শেষ আশ্রয় লক্ষ্ণৌয়ে গিয়া উঠিলেন। নবাব আসফ-উদ্দৌলা নিজে পরম পণ্ডিত ছিলেন; মুহসিনের বিদ্যা ও গভীর জ্ঞানের কথা তাঁহার কানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি হাজী মুহসিনকে সাদরে তাঁহার দরবারে আহবান করিলেন। কিন্তু হাজী তাঁহার আহবানে সাড়া দিলেন না। অগত্যা নবাব নিজেই তাঁহার কাছে আসিলেন। হাজী মুহসিন তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনায় কিছুদিন কাটাইয়া দিলেন। নবাব তাঁহাকে স্থায়ীভাবে লক্ষ্ণৌয়ে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মুহসিনের মন তখন অন্যত্র। বিতৃষ্ণ বিরাগী মন তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে যেন কাঁচা হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়ে মন তাঁহার আসক্ত হইতে চায় না, ধন-সম্পত্তি তাঁহার কাম্য নয়; তবু কোথায় কি যেন একটা ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে। কোলাহলময় নগরীর অশান্তি তাঁহার ভালো লাগে না, পল্লীর নিভৃত কোণে গিয়া জ্ঞানচর্চা করিলে কি তিনি শান্তি পাইবেন? অসম্ভব কি? মুহসিন পুনরায় মুর্শীদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বের গৌরব-ময়ী নগরী আজ শ্রীহীন; নবাবের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাবও আজ চলিয়া গিয়াছে। সাতাশ বৎসর আগে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন; ইহারই মধ্যে কতো না পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। মুর্শীদাবাদের সে রাজশ্রী আর নাই; নবাবের

সে দরবার নাই; সেনা-সৈন্যের সে সমারোহ নাই, বাংলার রাষ্ট্র-কেন্দ্রের আগেকার সে জীবনই এখন আর নাই। তথাপি বৃদ্ধ বয়সে—ষাট বৎসরে মুহসিন আবার এখানেই ফিরিলেন।

কিছুদিন এখানে কাটাইয়াও তিনি শান্তি পাইলেন না; অগণিত তীক্ষ্ণ কণ্টক যেন তাঁহার হৃদয়ে বিঁধিতে লাগিল। মুর্শীদাবাদে আসিবার পর তাঁহার জ্ঞান গরিমা ও বিদ্যাবত্তার কথা শুনিয়া নবাব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; একবার নয় দুইবার নয়, অনেকবার আসিলেন। কিন্তু মুহসিন একদিনের জন্যও নবাবের প্রাসাদে গমন করিলেন না। কণ্টকের ঘায়ে জর্জরিত মন লইয়া কি করিয়া তিনি নবাবের প্রাসাদে যাইতে পারেন? নবাব মুহসিনকে ভালো করিয়াই জানিতেন; তিনিও কোনোদিন মুহসিনকে তাঁহার প্রাসাদে যাইবার জন্য আহ্বান করেন নাই।

এই সময়ে মুর্শীদাবাদে তিনি দরবেশের জীবন যাপন করিলেন। তাঁহার অর্থ নাই; কিন্তু অর্থে তাঁহার কি প্রয়োজন? প্রত্যূষে ফজরের নামাজ পড়িয়া তিনি কোরআন পাঠ করিতেন। তারপর নিজের হাতে রান্না করিয়া সমাগত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বসিয়া আহার করিতেন। কেহ সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি যথাসাধ্য তাহার অভাব মোচন করিতেন। হাজী মুহম্মদ মুহসিনের হস্তলিপি অতি সুন্দর ছিল; তিনি কোরআন লিখিতেন। তাহা অনেক মূল্যে বিক্রী হইত। এই অর্থ হইতে তিনি প্রার্থীদের সাহায্য করিতেন। ইহা ছাড়া সেলাই ও লৌহকারের কাজও তিনি করিতেন। যৌবনের শিক্ষা আজ দরিদ্রের অভাব মোচনের জন্য কাজে আসিল। দরজী ও লৌহকারের কাজ করিয়া রাত্রিতে যতোটুকু অবসর পাইতেন কোরআন লিখিতেন। ইহাতে তাঁহার যে কতো কষ্ট হইত, তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। তথাপি মুহসিন বৃদ্ধ বয়সে এই কষ্ট হাসিমুখে বরণ করিলেন।

হাজী মুহম্মদ মুহসিন পরম পণ্ডিত ব্যক্তি; চিত্ত তাঁহার কল্পনা-কুশল, দৃষ্টি তাঁহার আকাশের মতো উদার, মন তাঁহার বাধাবন্ধহীন, মুক্ত। দেশ-বিদেশে বেড়াইয়া তিনি যে-বিপুল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহার সুন্দর হস্তলিপি দিয়া সে-সমস্তই পুস্তকের আকারে স্তরে স্তরে সাজাইয়াছিলেন। মানুষের মঙ্গল তাঁহার

মাথার মণি, জগতের হিতসাধন তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা অনাগত মানুষের জন্য লিখিয়া রাখিয়া যাইবেন, ইহার চেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু আমরা এখন মুহসিনের লিখিত কোনো ভ্রমণ বৃত্তান্ত দেখিতে পাই না। মুহসিনের চিত্তে যে-বিপ্লব উপস্থিত হওয়ার ফলে তিনি দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, হয়তো তাহা অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় তিনি স্বরচিত গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন। মানুষের মন যখন বাহিরে কোথাও সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায় না তখন আপনার মনো-জগতে সে আশ্রয় লয়। তারপর কোনো ছিদ্রপথের সন্ধান পাইলেই তাহার রুদ্ধ বেদনা দুর্বার গতিতে বাহিরে চলিয়া আসে। এই জন্য সাহিত্যসেবকের রচনায় ব্যথিত চিত্তের যে-প্রকাশ, তাহা আবেগময়, প্রাণস্পর্শী। হয়তো মুহসিনের রচিত ভ্রমণ-কাহিনীরও এই সৌন্দর্য প্রচুর পরিমাণে ছিল; এবং হয়তো সেই কারণেই আমাদের বইখানি পাইবার পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

দানবীর মুহসিন

প্রিয়তমা ভগিনী মন্নুজান খানমের বৈধব্যদশার কথা শুনিয়াও মুহসিনের মন গলে নাই। তাঁহার চিত্ত সে-সময় ভাবাবেগে আন্দোলিত হইয়া বৈরাগ্যের পথে ছুটিয়াছিল। তিনি ভগিনীর বিপদে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান নাই। তাহার পর অনেক বৎসর অনন্ত কালের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তথাপি মুহসিন আসেন নাই। মন্নুজান খানম বিদুষী, বুদ্ধিমতী, ; তিনি নিজের স্বামীর এবং ভ্রাতার বিস্তৃত জমিদারী অসাধারণ যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। কতো কুচক্রীর ষড়যন্ত্র, কতো হিংসুকের হিংসাদ্বেষ, কতো শত প্রলোভনের মায়া তুচ্ছ করিয়া আপনার কর্তব্য সমাপন করিয়াছেন। তাঁহার স্বামী সালহুদ্দীন যখন মারা গেলেন, তখনো মন্নুজানের যৌবন একেবারে চলিয়া যায় নাই। অসামান্য তাঁহার রূপ, অপরিমিত তাঁহার ধনসম্পত্তি। তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইবার ইচ্ছা কাহার না হয়? হুগলীর অনেক রূপবান গুণবান যুবক, অনেক প্রতিষ্ঠাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিধবা মন্নুজানের পাণিপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু তিনি পুনর্বার বিবাহের প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিলেন। নবাব খান জাহান খান হুগলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনিও তাঁহার পাণি প্রার্থনা করিয়া লোক পাঠাইলেন। মন্নুজান ঘটককে বলিলেন: "সংসারে প্রেমের মতো মূল্যবান জিনিস আর কিছুই নাই; অর্থসম্পত্তি প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত হেয় পদার্থ, উহার কোনো মূল্যই নাই। নবাব বাহাদুর আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতেছেন; মনে হয় যেন অর্থ-সম্পত্তির দিকেই তাঁহার দৃষ্টি, আমার প্রেমে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই। নবাব বাহাদুরের কতো বড়ো মর্যাদা তাহা আমি জানি; তিনি যখন প্রেমাকাঙ্ক্ষী নন, তখন অর্থ

সম্পত্তির মতো হেয় জিনিস দিয়া আমি কিরূপে তাঁহার অসম্মান করিতে পারি ?

নবাব বাহাদুরকে তিনি এইভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন ; ইহাতে তাঁহার বিপদ অনেক বাড়িয়া গেল। তিনি একাকী জমিদারী পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, কর্মচারীদের বিশ্বস্ততাই তাঁহার প্রধান সম্বল। তাঁহার শত্রুরা কর্মচারীদের ভাঙাইতে শুরু করিয়া দিল। মন্নুজানের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা এই ব্যাপারে যেন একেবারে শতমুখী হইয়া উঠিল। কর্মচারীদের আহবান করিয়া তিনি বলিলেন : আমার শত্রুরা আমার অনিষ্ট করিবার জন্য তোমাদের প্ররোচনা দিতেছে। যদি তোমাদের কেহ মনে কর : আমার ব্যবহারে বা কার্যে অসন্তোষের কারণ ঘটিয়াছে, তাহা এখনই খুলিয়া বল, আমি তাহার প্রতিকার করিতে প্রস্তুত। আর যদি কেহ মনে কর : শত্রুর প্রলোভনের সম্মুখে আত্মসংবরণ করিতে পারিবে না, দুর্বলতার বশে হয়তো আমার অনিষ্ট করিয়া বসিবে, আমার জমিদারী হইতে এখনই বিদায় গ্রহণ কর। তাহার পরিবারবর্গের জন্য আমি কিছু ভাতার ব্যবস্থা করিয়া দিব। আর যাহারা মনে কর ; আমি কাহারও সহিত জ্ঞানতঃ অন্যায় ব্যবহার করি নাই এবং যাহাদের অন্তরে এইটুকু শক্তি আছে যে, প্রলোভন আসিলেও মালিকের ক্ষতি কোনো মতেই করিবে না, তাহারাই কেবল কার্য করিতে থাকো। তোমরা নিশ্চয় জানিও : আমি অতঃপর কাহারো কোনো ইচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা করিব না ; বরং যদি বুঝিতে পারি : কেহ জ্ঞানতঃ আমার বা আমার জমিদারীর কোনো অনিষ্ট করিয়াছ বা করিবার চেষ্টা করিয়াছ, আমি তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিব। মন্নুজান খানমের কর্মচারীদের মধ্যে সকলেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তাঁহার কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার সবই ছিল আদর্শস্থানীয়। তাই তাঁহারা খানমের সম্মুখে সানন্দে নূতন করিয়া বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি দিয়া আপন আপন কর্মস্থানে চলিয়া গেলেন। মন্নুজানের শত্রুরা ব্যাপার সুবিধার নয় বুঝিয়া অনেকটা নিরাশ হইয়া পড়িল ; তাহাদের ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল।

এইভাবে নানারূপ বিপদ ও বৈষয়িক কার্যের গুরুভার মস্তকে বহন করিয়া মন্নুজান সাতাশটি বৎসর কাটাইয়া দিলেন। এখন তিনি বৃদ্ধ ; সংসারের এতো গোলযোগ-হাঙ্গামা তাঁহারে আর ভালো লাগে না। এখন যদি মুহসিন তাঁহার কাছে আসিতেন। বাল্যের খেলার সাথী, যৌবনের দোসর, স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য তাঁহার মন যেন পাগল হইয়া উঠিল। না, না, মন্নুজান সংসারের বোঝা বহিয়া আর চলিতে পারেন না। প্রতিদিন জমিদারী কাচারীতে বসিয়া তাঁহাকে বিষয়কার্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয় ; এই সময়—যখন পরপারের ডাক তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—এ-সময়েও কি তাঁহার জীবন এইরূপ বিষয় লিপ্ততার মধ্যে কাটিবে ? তিনি মুহসিনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হাজীও যেন প্রিয়তমা ভগিনীর এই আহবানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মুর্শীদাবাদে তাঁহার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল ; সাতাশ বৎসর পূর্বের সেই রাজশ্রীমণ্ডিত মুর্শীদাবাদের চিত্র স্মরণ করিয়া অন্তর তাঁহার গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল। মন্নুজানের আহবান শুনিয়া তিনি আর বিলম্ব করিলেন না ; যতো সত্বর পারিলেন হুগলী চলিয়া আসিলেন।

বহু বৎসর পরে ভাই-ভগিনীতে আবার মিলন হইল। বৃদ্ধা ভগিনী বৃদ্ধ ভাইকে আবার যেন আপনার স্নেহাঞ্চলের মধ্যে ডাকিয়া লইলেন। মন্নুজান হাজী মুহম্মদ মুহসিনের হস্তে জমিদারীর সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মুর্শীদাবাদে যিনি স্বহস্তে রান্না করিয়া দরিদ্র ভিক্ষুকদের খাওয়াইতেন, নিজে তাহাদের সহিত একত্রে বসিয়া খাইতেন, সেই সন্ন্যাসী ফকির আজ প্রাসাদবাসী জমিদার। শত শত ভৃত্য পরিচারিকা তাঁহার হুকুমবরদার। মন্নুজান খানমের আর কোনো ভাবনা নাই। তিনি যোগ্য ভ্রাতার হস্তে জমিদারীর ভার দিয়া পরকালের চিন্তায় মশগুল। হাজী তাঁহার অপূর্ব সুন্দর ভাষায় তাঁহার বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী মন্নুজানকে শুনান, আর ভগিনী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্নেহাস্পদ ভ্রাতার দিকে চাহিয়া থাকেন। তাঁহার ভ্রাতার সাহস, ধৈর্য, অধ্যাবসায় কী অপূর্ব। খোদার মহিমা কী অনন্ত !

মন্নুজান খানম এই সব কথা ভাবেন আর খোদার প্রতি ভক্তিতে অন্তর তাঁহার দ্রবীভূত হইয়া যায়।

এইরূপ গভীর স্নেহসুখে ভ্রাতা-ভগ্নীর দিন কাটিল, সপ্তাহ কাটিল, মাস কাটিল, একমাস দুই মাস করিতে করিতে কতো মাস কাটিয়া গেল। বৎসর গেল, আবার বৎসর আসিল। ক্রমে মন্নুজানের শেষ দিন ঘনাইয়া আসিল। তিনি স্নেহাস্পদ ভাইকে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি দান করিয়া পরম শান্তির সহিত শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন (১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ; বাঙ্গালা ১২১০ সন)।

গৃহত্যাগী ফকির মুহসিন এখন বাধ্য হইয়া সংসারের যাবতীয় কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু মন তাহার সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। রাজর্ষি খলিফা ওমর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মালিক হইয়াও যেমন দরিদ্রের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, মুহসিনও তাহাই করিতে লাগিলেন। বুদ্ধি তাহার বিষয়কর্মে সংলিপ্ত! কিন্তু মন তাহার পৃথিবীর ধূলিমাটির অনেক ঊর্ধ্বে। মানুষের কল্যাণ-সাধন তাহার জীবনের প্রধানতম ব্রত; দিবারাত্রি তিনি তাহারই ধ্যানে নিমগ্ন। খোদার নাম তাহার অন্তরে আঁকা হইয়া গিয়াছে। বন্ধু রজব আলী খাঁ ও সাকীর আলী খাঁ তাহার প্রিয় সহচর। তাহাদের সহিত ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় বিষয়-কর্মের মধ্যেও তিনি শান্তি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

হাজী মুহম্মদ মুহসিন ভগিনী মন্নুজানের দানসূত্রে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তাঁহার বয়স তখন সত্তর বৎসর। হুগলীর বন্দে আলী নামে একটি লোক আপনাকে মন্নুজানের পালিত পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া মুহসিন সাহেবের বিরুদ্ধে এক মকর্দমা উপস্থিত করিলেন। কিন্তু আদালতে হাজী সাহেবের জয় হইল, বন্দে আলী হারিয়া গেলেন। ইহার পর হাজী মুহসিনের কর্তৃত্বাধিকার সম্পর্কে আর কেহ কোনোরূপ আপত্তি উত্থাপন করে নাই।

মন্নুজানের মৃত্যুর পর হাজী মুহম্মদ মুহসিনের জীবনে অনেকখানি পরিবর্তন আসিল। প্রিয়তমা ভগিনী তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন এখন এ-সংসারে তিনি একা—নিতান্ত একা। আপনার

বলিতে জগতে তাঁহার আর কেহই নাই। হাজী মুহসিনের কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। কয়েক বার তাহার জীবনে এইভাব আসিয়াছে কিন্তু এমন নিঃসহায়তার ভাব তিনি আর কখনো অনুভব করেন নাই। তাঁহার বিপুল জমিদারী কয় দিনের জন্য? তিনি বিবাহ করেন নাই; দেশের ভাগ্য তাঁহার ভাগ্য হইতে বিবাহিত জীবনের সুখ চিরদিনের জন্য ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে। তাঁহার পরে অর্থ-সম্পত্তি কে ভোগ করিবে? বন্ধু রজব আলী ও সাকীর আলী আগে যেমন আসিতেন, এখনো তেমনই আসিয়া থাকেন তাহাদের সহিত ঠিক আগেরই মতো ধর্মালাপ চলিয়া থাকে। তথাপি যেন কেন হাজী মুহসিন মনে মনে মনে একটি নুতন অসোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

ভগিনী-বিরহ কাতর ভ্রাতা ভাঙা মন লইয়া সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দক্ষতাগুণে শীঘ্রই সম্পত্তির আয় দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইল। ,ইহা দিয়া তিনি কি করিবেন? এই চিন্তাই মুহসিন সাহেবকে বিব্রত করিয়া তুলিল। ফকির মুহসিন বিরাট জমিদারী পাইয়া বাদশাহী করিলেন না বাদশাহী তিনি করিতে পারিতেন না, সে প্রকৃতিই তাঁহার নয় কেননা তাঁহার জীবন অন্য ভাবে গঠিত হইয়াছিল। তিনি যতোদিন বাঁচিবেন, মানুষের মঙ্গল করিবেন, ইহা তাঁহার কাছে কিছু নুতন কথা নয়। কিন্তু তারপর? তাঁহার মৃত্যুর পর?

হাজী মুহসিন এই প্রশ্নের জবাব খুঁজিতে লাগিলেন। দীন দুঃস্থ দরিদ্রের সেবায় তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিলেন। তাঁহার অনন্ত সুষমামণ্ডিত চিত্ত বিকশিত হইয়া চারিদিকে গন্ধ বিস্তার করিল। যেখানে দারিদ্র্যের দুঃখ, মুহসিনের দয়ার হস্ত সেখানেই প্রসারিত হইল; যেখানে রুগ্নের আর্ত রব সেখানেই তাহার অকুণ্ঠিত সেবা বিতরিত হইল; যেখানে অন্ধ আতুর খঞ্জ সেখানেই তাহার হাতের যষ্টি তাহাদের সাহায্যে উত্তোলিত হইল। অন্নদান, বস্ত্রদান, ভিক্ষাদান, শিক্ষাদান, বিভিন্ন রকমের ধর্মানুষ্ঠান -এতোসব করিয়াও হাজী মুহসিনের চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় না। রাজর্ষি ওমরের মতো তিনি রাত্রিযোগে ঘুরিয়া বেড়ান। কে কোথায়

আর্ত ব্যথিত চোখের জলে নিশি যাপন করিতেছে; কোথায় কোন দীন দরিদ্র অনাহারে নীরব বেদনায় রাত্রি কাটাইতেছে; কে কোথায় রোগশয্যায় শুশ্রূষা না পাইয়া হা-হুতাশ করিতেছে —ইহাদের সকলের খোঁজ তো তাঁহার কাছে আসিয়া পৌঁছে না। তাই রাত্রিতে তাঁহার ঘুম হয় না; মানুষের দুঃখের কাঁটা যেন তাঁহার হৃদয়ে গিয়া বিঁধিতে থাকে। তিনি উঠিয়া পড়েন; নিঃশব্দে কাহারো গৃহ-কোণে, কাহারো রুদ্ধদ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া দুঃখার্তের মনের ব্যথা জানিবার চেষ্টা করেন। অর্থ তাঁহার কিসের জন্য? মানুষের সেবা যদি তিনি না করিলেন, কিরূপে তাঁহার ধর্মজীবন সফল হইল? আল্লার বন্দেগী তাঁহার কিরূপে সার্থক হইল? তাই মানুষের দুঃখের তত্ত্ব না লইলে হাজী মুহসিনের জীবনের কার্য অসমাপ্ত থাকিয়া যায়; চোখে তাঁহার ঘুম ধরে না।

মানুষের মঙ্গল হইল তাঁহার জীবনের কাম্য ধন। মরণের পরে তাহার এই কামনা পূর্ণ হইতে পারে না কি? মুহসিনের আগেকার সেই প্রশ্নের উত্তর এখনো কি সন্ধান করা হয় নাই? শত শত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত তাঁহার জীবনকে যে-পথে চালাইয়া নিয়া গিয়াছে, সেখানে কি ইহার জবাব মেলে না? হাজী মুহসিন আপনার জীবন বাল্যকাল হইতে অলোচনা করিলেন। মদিনায় স্বপ্নের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার জীবন-সন্ধ্যা তো আসিয়া পড়িয়াছে। কী সে মহৎ কার্য, যাহা তাঁহার দ্বারা সাধিত হইবে? মুহসিন ভাবিলেনঃ কই কিছুই তো দেখিতে পাই না। আমার সম্পত্তি আমি লোক-হিতার্থে উৎসর্গ করিতে পারি; সে তো এমন কোনো মহৎ কার্য্য নয়। প্রভুর ইচ্ছা কি তবে পূর্ণ হইবে না! হয়তো আমি সে মহৎ কার্য্যের যোগ্য হইতে পারি নাই; তাই হয় তো প্রভুর আশা আমি পূর্ণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার দ্বারা যাহা হইতে পারে—ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে তাহাই করিতে হইবে। ইহার অধিক আমার সাধ্য কি?

হাজী মুহম্মদ মুহসিন জরা-বার্ধক্যের কবলে পড়িয়া ক্রমেই দুর্বল হইতেছিলেন। ভগিনীর অন্তর্দ্ধানে তাঁহার শক্তি-স্বাস্থ্য ক্রমেই যেন চলিয়া যাইতেছিল। তিনি সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান করিয়া

যেন আর পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছিলেন না। তাই একদিন তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য—আল্লার পথে—তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি দান করিলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে এপ্রিলে (১৯ শে বৈশাখ, ১২৩১ সন; ১২২১ হিজরী) তাঁহার দানপত্র লিখিত হইল। তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু রজব আলী খাঁ ও সাকীর আলী খাঁকে দানকৃত ওয়াক্‌ফের মতোয়াল্লী নিযুক্ত করিলেন।

এইবার বোধ হয় হাজী মুহসিনের অন্তরে কিছু শান্তি আসিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মঙ্গল অনুষ্ঠান অবাধে চলিতে থাকিবে, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিলেন।

সম্পত্তি টাকাকড়ি তিনি রাখিয়া গেলেন; তাঁহারা—নিশ্চয়ই যাহাতে হাজী মুহসিনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় এমনভাবে কাজ করিবেন।

ওয়াক্‌ফনামা লিখিত হইবার পর হাজী মুহম্মদ মুহসিন কয়েক বৎসর মাত্র বাঁচিয়া ছিলেন। এই কয়টি বৎসর তিনি সম্পত্তির শৃঙ্খলা-বিধানে ব্যয় করিলেন। যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর দান-পত্র সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠিতে না পারে, যাহাতে তাঁহার সম্পত্তি লইয়া কোনোরূপ গোলযোগ ঘটিতে না পারে, তিনি অনন্যমনে তাহাই করিতে লাগিলেন। হুগলীর হিত-চিন্তা ছাড়া তাঁহার আর কোনো কার্যই রহিল না। সম্পত্তির শৃঙ্খলা বিধান এবং মানুষের কল্যাণ-সাধন—ইহাতেই তাঁহার শেষ কয়টি বৎসর কাটিল। হুগলীতে তিনি একটা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন। দুইজন মুনশী এখানে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা দিতেন। ছাত্রদের কাছে এক পয়সাও বেতন চাওয়া হইত না।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে হাজী মুহম্মদ মুহসিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু নবাব ইনতেজাম-উদ্দৌলা নসরতুল-মুল্‌ক সৈয়দ আলী খাঁ নসরৎ জঙ্গ্ বাহাদুর ঢাকায় যাইবার জন্য তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ করেন। কেহ বলেন, হাজী সাহেব রুগ্ন শরীরে বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কেহ বলেন, তিনি বহু বার ঢাকায় গিয়াছিলেন। হয়তো তিনি বহু বার ঢাকায় গিয়াছিলেন; কিন্তু বন্ধুর শেষ বারের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১২২৬ হিজরীতে তিনি একবার যশোহরে গিয়াছিলেন।

১২২৭ হিজরীতে বৃদ্ধ, হাজী মুহম্মদ মুহসিনের রোগ বৃদ্ধি পাইল। কিছুকাল রোগভোগ করিয়া তাঁহার অমর আত্মা পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল (২৪ শে জিল্‌কদ, ১২২৭ হিজরী। ১৬ই অগ্র-হায়ণ, ১২৩৯ সন। ২৯ শে নবেম্বর, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার)। হুগলীর ধনী-দরিদ্র ইতর-ভদ্র সকলেরই চোখের জলে বুক ভাসিল। দুনিয়া হইতে একটি দয়ালু অন্তর, মমতায় ভরা অমূল্য একটি হৃদয় চলিয়া গেল। কিন্তু মুহসিন সত্যই মরিলেন কি?

মুহসিন ফাণ্ড

হাজী মুহম্মদ মুহসিনের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির যাহা আয়, তাহা হইতেই মুহসিন ফাণ্ডের সৃষ্টি। এখন গবর্নমেণ্ট এই তহ্‌বিল পরিচালনা করিয়া থাকেন। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যত কর্মচারী আবশ্যক, তাহাদের বেতন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ বাদে উহার সমস্ত আয়ই হুগলী ইমামবাড়া ও অন্যান্য লোক-হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় করা হয়। অনেক মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাসের ব্যয় এই ফাণ্ড হইতে দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর বহু ছাত্র মুহসিন ফাণ্ড হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন। পরলোকগত মাননীয় জাস্টিস সৈয়দ আমীর আলী এই তহবিল হইতে সাহায্য পাইয়াছিলেন।

হাজী মুহম্মদ মুহসিন তাঁহার প্রিয় বন্ধু রজব আলী খাঁ ও সাকীর আলী খাঁকে যুক্তভাবে তাঁহার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির প্রথম মতোয়াল্লী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যতদিন হাজী মুহসিন জীবিত ছিলেন রজব আলী ও সাকীর আলী বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর বন্ধুদের মতিগতি বদলিয়া গেল। তাঁহারা বন্ধুর পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তি গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা প্রথমে হাজী মুহসিনের ওয়াক্‌ফ-নামা গোপন করিয়া সমস্ত সম্পত্তি নিজেদের বলিয়া প্রচার করিতে চাহিলেন। তাহা যখন সম্ভব হইল না তখন সম্পত্তির আগের কতক অংশ নিজেরা আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মতোয়াল্লী সাকীর আলী খাঁ মারা গেলেন (১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁহার পুত্র বাকের আলী খাঁ পিতার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। তখন রজব আলী খাঁও মতোয়াল্লী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুত্র ওয়াসেক আলী খাঁকে

সেখানে বসাইয়া দিলেন। ওয়াসেক আলীর অপর নাম মোগলজান। মোগলজান ও বাকের আলী মিলিয়া মিশিয়া সম্পত্তি পরিচালনা করিতে পারিলেন না, তাহাদের মধ্যে অনবরত কলহ হইতে লাগিল। তাহার কারণ এই দুইজনও সম্পত্তির আয় হইতে টাকা ভাঙিতে-ছিলেন। ব্যাপার সুবিধার নয় দেখিয়া সরকারী বোর্ড অব্ রেভেনিউ হাজী মুহম্মদ মুহসিনের সম্পত্তি মতোয়াল্লীদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নবাব আলী আকবর খাঁকে সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও মতোয়াল্লীদ্বয়ের কার্যাকার্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি-বার জন্য নিযুক্ত করিলেন। মোগলজান ও বাকের আলী গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করিলেন; কিন্তু কোনো ফল হইল না। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের আইনের বলে বোর্ড অব রেভেনিউর এরূপ কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, আদালতে ইহাই প্রমাণিত হইয়া গেল।

হাজী মুহম্মদ মুহসিনের ওয়াক্‌ফ-নামা অনুসারে প্রথম যুক্ত-মতোয়াল্লী হইলেন রজব আলী খাঁ ও সাকীর আলী খাঁ। তারপর তাঁহাদের দুইজনের পুত্র—ওয়াসেক আলী খাঁ ও বাকের আলী খাঁ। তাঁহাদের কর্তৃত্বাধিকার গবর্নমেণ্ট কাড়িয়া লইয়া নবাব আলী আকবর খাঁকে মতোয়াল্লী নিযুক্ত করিলেন। তাহা হইলে হাজী মুহসিনের ইচ্ছা অনুসারে মাত্র চারজন মতোয়াল্লী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের পর হইতে মুহসিন ফাণ্ডের পরিচালক নিযুক্ত করিয়াছেন গবর্নমেণ্ট।

নবাব আলী আকবর খাঁ তখনকার সিনিয়র লোকাল এজেণ্ট, মিষ্টার ডি, সি, স্মিথের সঙ্গে মিলিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন; আগেকার মতোয়াল্লীরা ১৫,০০০ টাকা তসরূপ করিয়াছেন। অনুসন্ধান শেষ হইবার পূর্বেই রজব আলী খাঁর মৃত্যু হইল। মিষ্টার স্মিথের রিপোর্ট সরকারে দাখিল হইয়া গেলে যশোহরের কালেকটর সাহেব সিদ্ধান্ত করিলেন, যে, মতোয়াল্লীরা এই তসরূপের জন্য দায়ী। গবর্নমেণ্টও সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন। এই সময় হইতে গবর্নমেণ্ট নবাব আলী আকবর খাঁকে স্থায়ীভাবে মতোয়াল্লীর পদে বহাল করিলেন।

এদিকে তদন্তের ফলাফল প্রকাশিত হইবার পর বাকের আলী খাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল, পাগল বলিয়া তাঁহার নাম লেখা হইল। ওয়াসেক আলী খাঁ গবর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত উলটাইয়া দিয়া পুনর্বার মতোয়াল্লীর পদ লাভ করিবার আশায় সদর দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমা শুরু করিলেন। কিন্তু এখানে কোনো ফল পাইলেন না। বিচারক মন্তব্য করিলেন, যে, রজব আলী খাঁ ও বাকের আলী খাঁ গবর্নমেণ্টের তদন্তের ফলে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাঁহারা ১৮১০ খীষ্টাব্দের ৫ আইন অনুসারে মতোয়াল্লীর পদ হইতে অপসারিত এবং নবাব আলী আকবর খাঁ উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিচারকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল হইল। ওয়াসেক আলী খাঁ কলিকাতার উচ্চ আদালত হইতেও যখন অনুকূল রায় পাইলেন না, তখন তিনি বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ মীমাংসা হইয়া গেল; প্রিভিকাউন্সিলেও ওয়াসেক আলী খাঁ হারিয়া গেলেন।

এই মকদ্দমা প্রায় ১০ বৎসর চলিয়াছিল। এই কয় বৎসরে সম্পত্তির আয় হইতে অনেক টাকা জমিয়া গেল। জমা টাকার পরিমাণ--৮,৬১,১০০। গৃহ নির্মাণ, ইমামবাড়ার সংস্কার এবং অন্য দুই একটি কার্যের জন্য কিছু টাকা লইয়া একটি ট্রাষ্ট ফাণ্ড সৃষ্টি করা হইল। এই ট্রাষ্ট ফাণ্ডই সাধারণতঃ মুহসিন শিক্ষা তহবিল ফাণ্ড নামে পরিচিত। সকাউন্সিল গবর্নর জেনারেল স্থির করিলেন যে, এই ফাণ্ডের সুদ ও অন্যান্য উদ্বৃত্ত অর্থ যাহা কিছু পাওয়া যায় একত্র করিয়া শিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে এবং এখনই উহা হইতে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য একটি কলেজ নির্মিত হইবে। গবর্নর জেনারেল মনে করিলেন ঃ ফাণ্ডের টাকা এইভাবে ব্যয় করিলেই হাজী মুহসিনের সম্পত্তিদানের সাধু উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুহসিন ফাণ্ডের টাকায় হুগলীতে একটা কলেজ স্থাপিত হইল। হাজী মুহম্মদ মুহসিন মৃত্যুর পূর্বে ইমামবাড়ায় দুইজন মুনশীর তত্ত্বাবধানে একটি বিদ্যালয়

স্থাপন করেন। হাজী সাহেবের মৃত্যুর পর স্যাণ্ডিসন্ডিড নামক একজন ইংরাজ এই বিদ্যালয়টির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার দ্বারা ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। হুগলী কলেজ স্থাপিত হইলে এই বিদ্যালয়ের আর কোনো প্রয়োজন থাকিল না, এইজন্য কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়টি তুলিয়া দেওয়া হইল।

কলেজের দুই অংশে দুইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। প্রথম অংশে —ইংরেজী উচ্চশিক্ষা; দ্বিতীয় অংশে—প্রাচ্য শিক্ষা। শোনা যায়; কলেজ স্থাপনের পর তিন দিনের মধ্যেই উহার ছাত্রসংখ্যা বারো শতে পৌঁছিয়াছিল—ইংরাজী শিক্ষা বিভাগে নয় শত, এবং প্রাচ্য ভাষা বিভাগে তিন শত। মুহসিনের সম্পত্তির আয় হইতে হুগলী কলেজটি সাঁইত্রিশ বৎসর চালানো হয়। পরে এখানে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত কম হইয়া পড়ায় গবর্নমেণ্ট নিজ ব্যয়ে উহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার ফলে মুহসিনের সম্পত্তির আয় হইতে যে-ব্যয়টি বাঁচিয়া যাইতে লাগিল তাহা দিয়া গবর্নমেণ্ট হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা ও বোর্ডিং স্থাপন করিলেন। কতগুলি ছাত্রবৃত্তিও উহা হইতে সৃষ্টি হইল।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইমামবাড়া দাতব্য চিকিৎসালয়টি স্থাপিত হয়। বহু বৎসর পর্যন্ত মুহসিনের সম্পত্তির আয় হইতে এই চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইত। পরে ইমামবাড়া হাসপাতাল চুঁচুড়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে), এখন গবর্নমেণ্ট ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। ইমামবাড়ার নিম্নতলের একটি ঘরে এখনো একটি ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

নবাব আলী আকবর খাঁ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মতোয়াল্লী নিযুক্ত হন। প্রায় ১৯ বৎসর তিনি এই পদে কাজ করেন। কিন্তু শেষকালে তিনিও লোভ সম্বরন করিতে পারিলেন না। কিছু টাকা তহবিল হইতে ভাঙিবার অপরাধে পদচ্যুত হইলেন। তাঁহার স্থানে সৈয়দ আলী খাঁ মতোয়াল্লীর পদে বসিলেন (১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে)। সৈয়দ আলী খাঁ হাজী মুহম্মদ মুহসিনের বহু সম্পত্তি পত্তনি

দিলেন; তাহাতে ছয় লক্ষ টাকা পাওয়া গেল। এই টাকাটিও পূর্বকার উদ্বৃত্ত অর্থের সহিত যুক্ত হইল।

সৈয়দ আলী খাঁর পরে সৈয়দ জয়নুদ্দীন হোসেন খাঁ কিছু দিনের জন্য মতোয়াল্লীর পদ পান। কয়েক মাস পরেই মৌলবী সৈয়দ কেরামত আলী খাঁ মতোয়াল্লী হইলেন (১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)। মাসিক ৫০০ টাকা বেতন এবং সম্পত্তির আয়ের ৯ অংশ কেরামত আলী সাহেব পাইবেন, এইরূপ স্থির হয়। ইহার মত উৎসাহী, কর্মঠ ও শিক্ষিত মতোয়াল্লী আর কেহ নিযুক্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ।

হুগলীর বর্তমান ইমামবাড়া কেরামত আলী সাহেবের তত্ত্বাবধানেই নির্মিত হয়! ইমামবাড়া নির্মাণের প্রস্তাব উঠিলে কাহার উপর এই কার্যের গুরু দায়িত্বভার অর্পিত হইবে ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হয়? শেষে গবর্নমেন্ট মৌলবী কেরামত আলীর উপরেই এই কার্যের ভার দেন। ইমামবাড়া নির্মিত হইতে মোটামুটি তিন বৎসর লাগিয়াছিল। ব্যয় নির্ধারিত হইয়াছিল ২,৮৫,০০০ টাকা কিন্তু কেরামত আলী সাহেবের কার্যদক্ষতায় প্রায় ৭০,০০০ টাকা বাঁচিয়া গেল। গবর্নমেন্ট এজন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ইমামবাড়ার ঘড়িটি ১১,৭২১ টাকা মূল্যে বিলাত হইতে কিনিয়া আনা হয়।

হুগলীর ইমামবাড়ার দৃশ্য অতি সুন্দর। গঙ্গার জুবিলি ব্রিজ হইতে দেখিলে এই দৃশ্য দর্শকের চোখে আরো মনোহর রূপে ফুটিয়া ওঠে। এখান হইতে সুউচ্চ মিনার, সুবৃহৎ ঘড়িটি ও সুরম্য অট্টালিকা দেখিলে নয়নমন জুড়াইয়া যায়। ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে সম্মুখের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া—বিরাট সিংহদ্বার পার হইয়া যাইতে হয়। সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বৃহৎ জলাধার। তাহার সম্মুখে উপাসনা-গৃহ, বাকী তিন দিকে চক-মিলানো বাড়ি। মসজিদের প্রাচীরে কোরআনের আয়াতসমূহ খোদিত। গঙ্গার তীরে উপাসনা-গৃহের পশ্চাতে প্রাচীরের সম্মুখে হাজী মুহম্মদ মুহসিনের ওয়াকফনামা বড়ো বড়ো অক্ষরে খোদাই করিয়া রাখা হইয়াছে। মসজিদটি এতোই সুন্দর যে অনেকে মনে

করেন কায়রোর নগর-প্রাচীরের ভিতরকার সুদৃশ্য মসজিদটির সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে।

মৌলবী সৈয়দ কেরামত আলী খাঁর মৃত্যুর পর (১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ, ১০ ই আগস্ট) মৌলবী সৈয়দ আশরাফউদ্দীন আহমদ মতোয়াল্লীর পদে নিযুক্ত হন। আশরাফউদ্দীন সাহেবের চেষ্টায় হাজী মুহম্মদ মুহসিনের কবরের উপরে মর্মরখচিত একটি ক্ষুদ্র সমাধিগৃহ নির্মিত হইয়াছে। গবর্নমেন্ট এই কার্যের জন্য ৫০০০ টাকা দান করেন। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সমাধিপার্শ্বে একটি উৎসব-সভার আয়োজন হয়। কাঙ্গালী-ভোজন, আলোকসজ্জা প্রভৃতির জন্য মুহসিন ফাণ্ড হইতে ৬৪০ টাকা ব্যয়িত হয় (১৯০৬, ১০ই জুন)। হাজী মুহসিনের সম্পত্তি যখন প্রথম গবর্নমেন্টের হাতে আসে তখন উহার আয় ছিল বার্ষিক পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা (১৮৩৫ খ্রীঃ অঃ)। পরে সম্পত্তির আরো উন্নতি হইয়াছে; এখন উহার আয় মোটামুটি দেড় লক্ষ টাকা।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রিলিজস এণ্ডাউমেন্ট এ্যাক্ট প্রণীত হইলে গবর্নমেন্ট একটি কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করিয়া তাহায় হস্তে সম্পত্তির $\frac{৩}{৯}$ অংশের আয় ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইমামবাড়া সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মানুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান এই কমিটিই করিয়া থাকেন। জাস্টিস আমীর আলী এক সময়ে ইহার সভ্য ছিলেন।

মুহসিনের জীবনের কয়েকখানি ছবি

হাজী মুহম্মদ মুহসিনের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে ছোটো-খাটো অনেক কথা জানিবার আছে। তাহাতে মুহসিনকে বেশ খানিকটা চিনিতে পারা যায়।

প্রথমে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন। বিদেশ-ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বাংলায় ফিরিবার পর মুহসিন কখনো হুগলীতে, কখনো ঢাকায় এবং কিছুকাল মুর্শীদাবাদে অবস্থান করেন। সর্বত্রই লোকে তাঁহাকে পীরের মতো সম্মান করেন। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি নামাজ পড়িতেন, তারপর কোর্‌আন তেলাওত করিতেন। কোর্‌আন-পাঠ শেষ হইলে পদব্রজে অনেকদূর—কখনো কখনো পাঁচ ছয় মাইল— ভ্রমণ করিতেন। তারপর বিষয়-কর্ম দেখিতেন। কোর্তা, মির্জ্জাই, পাগড়ী— প্রভৃতি ছিল তাঁহার নিত্যব্যবহার্য পরিধেয়। ইহা ভিন্ন অন্য কোনো-রূপ সাজ-সজ্জা তিনি করিতেন না। জীবনের শেষ পর্যন্ত দাড়ি গোঁফ কামাইতেন।

হাজী মুহসিন ভালো রান্না করিতে পারিতেন, নিজের হাতে রাঁধিয়া পরকে খাওয়াইতে তিনি বড়ো ভালোবাসিতেন। দরিদ্র সাধু-সন্ন্যাসী ফকীর-দরবেশ প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের সঙ্গেই তিনি মিশিতেন। নবাব নাজিম তাঁহার কাছে প্রায়ই আসিতেন; কিন্তু মুহসিন কখনো তাঁহার দরবারে যাইতেন না। অহঙ্কার তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না; কিন্তু ধনী সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গ তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না।

হাজী মুহসিন প্রয়োজনীয় সেলাইয়ের কাজ নিজেই করিতেন, দর্জীর কাছে যাইতেন না। তিনি ভালো সেলাইয়ের কাজজা নিতেন। যৌবনের পূর্বেই তিনি ইহা শিখিয়াছিলেন।

মুহসিন নিজে শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও শিয়া-সুন্নী, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি কিছুই বিচার না করিয়া তিনি দুঃস্থ মানুষকেই অর্থ দান করিতেন। দীন দরিদ্র দুঃখী হইলেই তিনি তাহাকে দয়ার যোগ্য পাত্র মনে করিতেন, অন্য কোনো প্রশ্নই তাঁহার মনে আসিত না।

একবার কাজী-উল্-কোজ্জাত্ মৌলবী সিরাজউদ্দীন খাঁ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন: 'আপনি কেন এতো হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন? হাজী সাহেব উত্তর দিলেন: "শাহান্ শাহ্ আকবরের আমল হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে৷ আমি কি কারণে অন্যপথ অবলম্বন করিব? তাঁহার চেয়ে আমি নিশ্চয়ই বেশি 'আকেলমন্দ্' নই। হিন্দু কমচারীরা কর্মিষ্ঠ, অল্প বেতনেই তাহারা সন্তুষ্ট; তাহাদের বুদ্ধিমত্তাও প্রচুর, এ-সব সদ্গুণের মর্যাদা কি আমার চোখে কিছুই নাই?"

হাজী মুহসিন বৈষয়িকসূত্রে কয়েকজনের সহিত কয়েক বার মকদ্দমায় জড়িত হন। কিন্তু বৈষয়িক বিবাদ তাঁহার বুদ্ধি পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, তাঁহার অন্তরকে কখনো স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ আর কিছু নয়। হাজী সাহেব কর্তব্যের খাতিরে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিলেও সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন।

হুগলীর নবাব খান জাহানের সহিত হাজী মুহসিনের বহুদিন মকদ্দমা চলে। মকদ্দমায় হাজী সাহেবই জয়লাভ করেন। পরে নবাব খান জাহানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহার সঙ্গে এমন আন্তরিকতার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন যে, তাহা দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল। এমন মিষ্টি আলাপ এমন আন্তরিকতা-মাখা আদর-যত্ন!--যেন তাঁহাদের মধ্যে কোনো কালে কোনোরূপ মনোমালিন্য ঘটে নাই! কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। বৈষয়িক বিবাদ হাজী সাহেবের মনকে কলুষিত করিতে পারিত না। এইজন্য মকদ্দমার পরেও খান জাহানের সঙ্গে এমন মধুর ব্যবহার তিনি করিতে পারিয়াছিলেন।

হাজী মুহম্মদ মুহসিনের ব্যক্তিগত ছোটো বড়ো দানের সংখ্যা করা যায় না। প্রতি রাত্রিতে তিনি দুই একশত টাকা সঙ্গে লইয়া

ছদ্মবেশে শহরের অলিগলিতে—মহল্লায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। দীন দুঃখী অন্ধ আতুর যাহারই ব্যথা তিনি চক্ষে দেখিতেন, কানে শুনিতে পাইতেন তাহাকেই টাকা দিতেন। কাগজের পুঁটলিতে মুড়িয়া টাকা দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল। কেহ তাঁহার কাছে অর্থ সাহায্য চাহিয়া তাঁহার নাম সাধারণ্যে প্রচার করিয়া বেড়াক ইহা তিনি একদম পছন্দ করিতেন না।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে হাজী মুহসিন একটি মহল্লার ভিতর দিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন: একখানি জীর্ণ কুটির হইতে কয়েকটি শিশু কাঁদিয়া জননীর কাছে খাদ্য চাহিতেছে। মুহসিন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কুটীরের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। শিশু-গুলি খাবো খাবো বলিয়া কাঁদিতেছে আর জননী খাবার দিতে না পারিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন। ইহা দেখিয়া হাজী মুহসিন কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তখনই খাবার আনিয়া শিশুদের খাইতে দিলেন এবং সেই দিন হইতে ঐ দরিদ্র বিধবার সংসারের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন।

আর একদিন রাত্রিতে তিনি নৈশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পথে কিছুদূর চলিতে চলিতে তিনি শুনিতে পাইলেন: একখানি কুটির হইতে একটি আর্ত কণ্ঠের স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে কুটিরের পাশে গিয়া দেখিলেন: একটি স্ত্রীলোক তাহার অন্ধ স্বামীকে প্রহার করিতেছে। স্বামী সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়াছে কিন্তু বেশি কিছু ভিক্ষা সেদিন তাহার মিলে নাই। এই জন্য তাহার স্ত্রী রাগিয়া গিয়া স্বামীকে ধরিয়া মারিতেছে। ইহা দেখিয়া মুহসিন কুটিরের পিছন দিককার জানালা দিয়া এক থলি টাকা ফেলিয়া দিলেন। টাকাগুলি সশব্দে মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িল। অন্ধের স্ত্রী টাকাগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে মুহসিন সাহেবকে আশীর্বাদ করিল; অথচ সে তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পায় নাই। লোকে জানিত; এরূপ দান হাজী মুহসিন ছাড়া আর কারুর নয়।

আর এক রাত্রির কথা। হাজী সাহেব নৈশ ভ্রমণ শেষ করিয়া আপনার ঘরে আসিয়া শুইয়াছেন। এমন সময় একটি

চোর তাঁহাকে নিদ্রিত ভাবিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। হাজী মুহসিন কিন্তু তখনো ঘুমান নাই। তিনি চোরকে ধরিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তাহাকে প্রহারও করিলেন না, কোনোরূপ কটু কথাও বলিলেন না। শুধু বলিলেন: তুমি কেন চুরি করিতে আসিলে? তোমাকে যদি ধরাইয়া দিই, জানো তোমাকে নিশ্চয় জেলে যাইতে হইবে? চোর বলিল: আমি বড়োই গরীব, আমার স্ত্রী পুত্র সকলেই অনাহারে দিন কাটাইতেছে। তাহাদের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলিয়া দিবার অন্য কোনো উপায় করিতে না পারিয়া চুরি করিতে আসিয়াছি। আপনি আমায় মাফ করুন। চোরের এই কথা শুনিয়া হাজী সাহেব বলিলেন: তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর জীবনে আর কখনো এই কাজে আসিবে না, তাহা হইলে তোমার সংসারের অভাব আমি মোচন করিব; কিন্তু তোমাকেও খাটিয়া খাইতে হইবে। কাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিবে; তোমার দুঃস্বভাবের কথা আমি কাহাকেও বলিব না। চোর হাজী সাহেবের এই ব্যবহারে চোখের জলে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। হাজী মুহসিন তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বিদায় দিলেন। কালে এই চোরের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো হইয়াছিল। সে মুহসিনের এই অপূর্ব মহত্তের কথা আনন্দের সহিত সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইত।

দাসদাসীর প্রতি হাজী মুহসিনের ব্যবহার ছিল হজরত মুহম্মদের (সঃ) মতো। আঁ হজরতের এক ভৃত্য ছিল, আনেস তাহার নাম। সে হজরতের সেবা করিত, হজরতও তাহার অনেক কাজ করিয়া দিতেন। কে ভৃত্য কে প্রভু বুঝিয়া ওঠা মুশকিল হইত। আনেস হজরতের কাছে মুহূর্তের জন্যও কোনোরূপ রূঢ় ব্যবহার পায় নাই, তাঁহার মুখে কোনো দিন কড়া কথা শোনে নাই। বরং আনেসকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসিতেন, তাহার কোনো ভুল হইলে মিষ্ট কথায় তাহার ভুল বুঝাইয়া দিতেন। মানুষের সহিত মহামানুষের চিরদিন এই ব্যবহার। মুহসিন ভৃত্যদের সঙ্গে এইরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন। কোনোদিন কাহাকেও রূঢ় কথা বলিতেন না। কোনো হিতৈষী বন্ধু নিম্নপদস্থ বন্ধুর সঙ্গে যেরূপ মধুর ব্যবহার করে, মুহসিন সর্বদাই সেইরূপ করিতেন।

ভৃত্যদের কেহ অসুস্থ হইলে নিজে তাহার তত্ত্ব লইতেন, তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন।

শুধু এইটুকুই নয়। তাঁহার ভৃত্যদের বাড়িতে কেহ অসুস্থ হইয়াছে শুনিলে তাঁহার প্রাণ গলিয়া যাইত; তিনি অর্থ পথ্য ঔষধ তাহার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। একবার তাঁহার একটি বালক ভৃত্য তাহার বোনের অসুখের সংবাদ শুনিয়া হাজী সাহেবের কাছে বাড়িতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। হাজী সাহেব তাহার বাড়িতে যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল: আমার বোনের বড়োই অসুখ, খবর পাইয়াছি। হাজী সাহেব তখনই তাহাকে ছুটি দিলেন, এবং সঙ্গে দিলেন একটি পুঁটুলি। হাজী সাহেবের বোন ছিলেন মন্নুজান, তাঁহার প্রতি কী সীমাহীন ভালোবাসা তিনি পোষণ করিতেন! ভৃত্যের ভগিনীর অসুখের কথা শুনিয়া মন্নুজানের কথা তাঁহার মনে পড়িল। চিত্ত তাঁহার বেদনায় দুলিয়া উঠিল। ঔষধ ও টাকা পুঁটুলিতে বাঁধিয়া বালকের হাতে দিয়া তিনি বলিলেন: এই পুঁটলির মধ্যে দরকারী জিনিস রহিল, বাড়িতে গিয়া খুলিও, ইহাতে যে-ঔষধ পাইবে, তোমার বোনকে খাওয়াইবে। বালক বাড়িতে গিয়া পুটলি খুলিল; দেখিল: মুহসিন সাহেব শুধু ঔষধ দেন নাই, কিছু টাকাও দিয়াছেন। তাহার উচ্ছ্বসিত আনন্দ পীড়িত বোনটিকে শীঘ্রই চাঙ্গা করিয়া তুলিল। কৃতজ্ঞতার অপরিশোধ্য ঋণে সে আবার প্রভু-বন্ধুর কাছে ফিরিয়া আসিল।

এই ছিল হাজী মুহম্মদ মুহসিনের জীবন। অনেক ব্যক্তি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের খুঁটিনাটি আমরা জানি না যদি জানিতাম, তাহা-হইলে হয়তো ইতিহাসে তাঁহাদের সম্বন্ধে যত বড়ো বড়ো কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিতাম না। কেননা সাধারণের কাছে দূরে হইতে মানুষ যে-রূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহার ভিতরটি নিতান্তই খাঁটি সোনা না হইলে কাছের মানুষেরা সে-রূপে তাঁহাকে পাইতে পারে না, তাঁহাকে ভালোবাসা সম্মান শ্রদ্ধা দিতে পারে না। মানুষের প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত জীবনরূপের মধ্যে অনেক পার্থক্য

আছে ও থাকিতে পারে। থাকিতে পারে বলিয়াই প্রত্যেকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মহামানুষ নন, হইতে পারেন না। হজরত মুহম্মদ (সঃ), খলিফা ওমর (রাঃ) ইতিহাসে অমর; সীরাজ, নেপোলিয়ন, আকবর, ইহারাও খ্যাতিতে চিরদীপ্তিমান। কিন্তু হজরত মুহম্মদ (সঃ) বা খলিফা ওমরের (রাঃ) ব্যক্তিগত জীবনের অসংখ্য ছোটো বড়ো মহত্ত্ব একসঙ্গে মিলিয়া তাঁহাদিগকে মহামানুষের যে-স্তরে তুলিয়া দিয়াছে, সীজার নেপোলিয়ন আকবর ঠিক সে-স্তরে উঠিবার যোগ্য নন। কিন্তু আমাদের হাজী মুহম্মদ মুহসিন সীজারের মতো, নেপোলিয়নের মতো, আকবরের মতো জগৎ প্রসিদ্ধ না হইলেও মহামানুষ। মনুষ্যত্বের যাহা গৌরব তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন, মানুষে মানুষে ভেদ ভুলিয়াছিলেন, আপনাকে বিসর্জন দিয়া জগতের কল্যাণকে প্রিয়তম ভাবিয়াছিলেন, ধনসম্পদ বা অন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ-তার অধিকারী হইলে কেহ কাহাকেও রূঢ় কথা বলিবার অধিকারী নয়—ইহা তিনি কার্যে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, ধন সম্পদের মধ্যে বসিয়াও দরিদ্রকে আত্মীয়ের অধিক জ্ঞান করিয়াছিলেন, এবং তারপর জীবন সন্ধ্যায় আপনার সমগ্র বিপুল সম্পত্তি মানুষের মঙ্গলের জন্য অকাতরে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাই হাজী মুহম্মদ মুহসিন মহামানুষ; তাই মরজগতে সত্যই তিনি অমর।

মুহসিনের ওয়াক্‌ফনামা

(সারমর্ম)

আমি, হাজী মুহ্‌ম্মদ মুহসিন, পিতার নাম হাজী ফয়জুল্লাহ্‌, পিতামহের নাম আগা ফয়জুল্লাহ, সাং বন্দর হুগলী—আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে এবং অন্যের বিনানুরোধে শরীয়ত মোতাবেক নিম্নলিখিতরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি। যশোহর জেলার অন্তর্গত পরগণা কিস্‌মত সৈয়দপুর ও পরগণা সোবনল, হুগলীর ইমামবাড়া, ইমামবাজার ও হাট এবং স্বতন্ত্র তালিকা লিখিত ইমামবাড়াসংলগ্ন যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি। এক্ষণে আমার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি কোনো প্রকার উত্তরাধিকারী না থাকায় আমি উক্ত সমস্ত সম্পত্তি আল্লার নামে দান করিয়া যাইতেছি।

শেখ মুহম্মদ সাদিকের পুত্র রজব আলী খাঁ ও আহ্‌মদ খাঁর পুত্র সাকীর আলী খাঁকে আমি মতোয়াল্লী নিযুক্ত করিয়া যাইতেছি। তাঁহারা একযোগে কার্য করিবেন। সম্পত্তির যাহা আয় তাহা হইতে দেয় রাজস্ব বাদে অবশিষ্ট টাকা নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার তিন ভাগ সৈয়দে-কায়েনাত্‌ শেষ নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ) ও নিষ্পাপ ইমামগণের ফাতেহা উপলক্ষে দান-খয়রাত প্রভৃতি এবং মোহররম পর্বের দশ দিনের ব্যয় বাবত খরচ করিবেন। এক এক ভাগ করিয়া দুই ভাগ মতোয়াল্লীগণ আপন আপন ব্যয় নির্বাহের জন্য লইবেন এবং বাকী চার ভাগ জমিদারীর কর্মচারীদের বেতন, বৃত্তিধারীদের নামের একটি তালিকা আমি স্বাক্ষর সিল মোহর করিয়া রাখিয়া গেলাম। মতোয়াল্লীরা ইচ্ছা করিলে যে-কোনো কর্মচারীকে রাখিতে বা ছাড়িয়া দিতে এবং যে-কোনো বৃত্তিধারীর বৃত্তি বহাল রাখিতে বা বন্ধ করিতে পারিবেন। যদি কোনো

মতোয়াল্লী কোনো কারণে কাজ করিতে অসমর্থ হন, তিনি অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তি তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ইতি ১৯ শে বৈশাখ, হিজরী ১২২১ সাল; বাংলা ৯২৩৯ সাল।

ওয়াসেক আলী খাঁ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে মকদ্দমা আনিয়া পরাজিত হওয়ার পর সকাউন্সিল গভর্নর জেনারেল মুহসিনের সম্পত্তি সম্বন্ধে যে আদেশপত্র প্রচার করেন (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) তাহার সারমর্ম এই ঃ

হাজী মুহম্মদ মুহসিন তাঁহার ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তির মতোয়াল্লী-দের উপরে যে-ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন, সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল মনে করেন যে সে-সমস্ত ক্ষমতাই এখন তাঁহার হাতে আসিয়াছে। এইজন্য সম্পত্তির আয় কি ভাবে ব্যয়িত হইবে, তাহা তিনিই নির্ধারণ করিবেন। তবে এ-বিষয়ে ওয়াক্‌ফ্‌-কর্তার ইচ্ছা যথাসম্ভব মানিয়া চলা হইবে।

দেখা যাইতেছে যশোহরের সম্পত্তির আয় ৪৫,০০০্ টাকা। এই আয়ের কথাই ওয়াক্‌ফ্‌ কর্তা বলিয়া গিয়াছেন। ইমামবাড়ার খরচ, মতোয়াল্লীদের বেতন সবই এই টাকা হইতে দেওয়ার কথা রহিয়াছে।

ওয়াক্‌ফ্‌নামার এই সব শর্ত অনুসারে গবর্নর জেনারেল নির্ধারণ করিলেন যে জমিদারীর আয়ের নয় ভাগের তিন ভাগ ইমামবাড়ার ব্যয় নির্বাহার্থ ব্যয়িত হইবে। মতোয়াল্লীদের বেতন সম্বন্ধে গবর্নর জেনারেল এই স্থির করিলেন যে, এখন হইতে দুই-জনের স্থলে একজন মতোয়াল্লী নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাকে সম্প-ত্তির আয়ের নয়ভাগের একভাগ $\frac{১}{৯}$ বেতন স্বরূপ দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় মতোয়াল্লীর প্রাপ্য বেতন বাবত জমিদারীর আয়ের যে নয় ভাগের আর এক ভাগ $\frac{১}{৯}$ দেওয়ার কথা ছিল, সেই টাকাটা জনহিতকর কোনো অনুষ্ঠানে ব্যয় করিবার জন্য উদ্বৃত্ত তহবিলের সঙ্গে মিলানো হইবে।

জমিদারীর আয়ের নয় ভাগের চার ভাগ $\frac{৪}{৯}$ বৃত্তি ও কর্মচা-রীদের বেতন বাবত নির্ধারিত হইয়াছে। এ-ব্যবস্থার রদবদল করা

চলে না। তবে অনেক বৃত্তিধারীর মৃত্যু হইয়াছে, কেহ বা বহুদিন হইতে আর বৃত্তি লইতেছেন না। ইহার দরুণ যে টাকাটি পাওয়া যাইতেছে, তাহাও উক্ত উদ্বৃত্ত তহবিলে যোগ করিলে কিছু অন্যায় করা হইবে না। হাসপাতালের ব্যয় অবশ্য বরাবর এই তহবিল হইতে দেওয়া চলিবে। কিন্তু শিক্ষার জন্য বর্তমানে যে টাকা ব্যয় করা হইতেছে, তাহা মূল তহবিল হইতেই দেওয়া হইবে।

উপরের ঐ সমস্ত নির্ধারণ অনুসারে সাধারণ জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করা চলিতে পারে এরূপ কিছু টাকা তিন উপায়ে গবর্নমেণ্টের হাতে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথম ঃ জমিদারীর আয়ের নয়ের এক (১/৯) অংশ, দ্বিতীয় ঃ অপ্রদত্ত বৃত্তি ; এবং তৃতীয় ঃ জমা উদ্বৃত্ত তহবিল, যাহার টাকা দিয়া কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া রাখা হইয়াছে।

সকাউন্সিল গবর্নর জেনারেলের মত এই যে, ইমামবাড়া ও অন্যান্য ধর্মমন্দিরগুলির সংস্কার এবং প্রয়োজন হইলে, পুনর্নির্মাণ কার্যে যাহা ব্যয় হয়, তাহা বাদে শেষোক্ত তহবিলের সমস্ত টাকাটা লইয়া একটি ট্রাষ্ট্ ফাণ্ড সৃষ্টি করা হইবে। এই টাকাটির সুদ এবং পূর্বোল্লিখিত অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্তব্য টাকা দ্বারা শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি কলেজ স্থাপন করা হইবে। সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল মনে করেন যে তহবিলের টাকা এইভাবে ব্যয়িত হইলেই দানকারীর মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে।